Approved by D. P. I., Bengal as a prize and library book.

তাপসী রাবেয়া

ভূতপূর্ব্ব নবনূর সম্পাদক

সৈয়দ এমদাদ আলী প্রণীত

মূল্য ৷৷৹ বার আনা

উপহার

আমার

পরম

নিদর্শনস্বরূপ

তাপসী রাবেয়া

উপহার

প্রদত্ত হইল।

তারিখ...... } ....
.... }

মোস্‌লেম-বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক
ও মোস্‌লেম বাংলা সাপ্তাহিকের আদি
প্রতিষ্ঠাতা, সমাজ-হিতকামী
মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ
সাহেবের করকমলে
রচয়িতার শ্রদ্ধার উপহার

তাপসী রাবেয়া

—০:*:০—
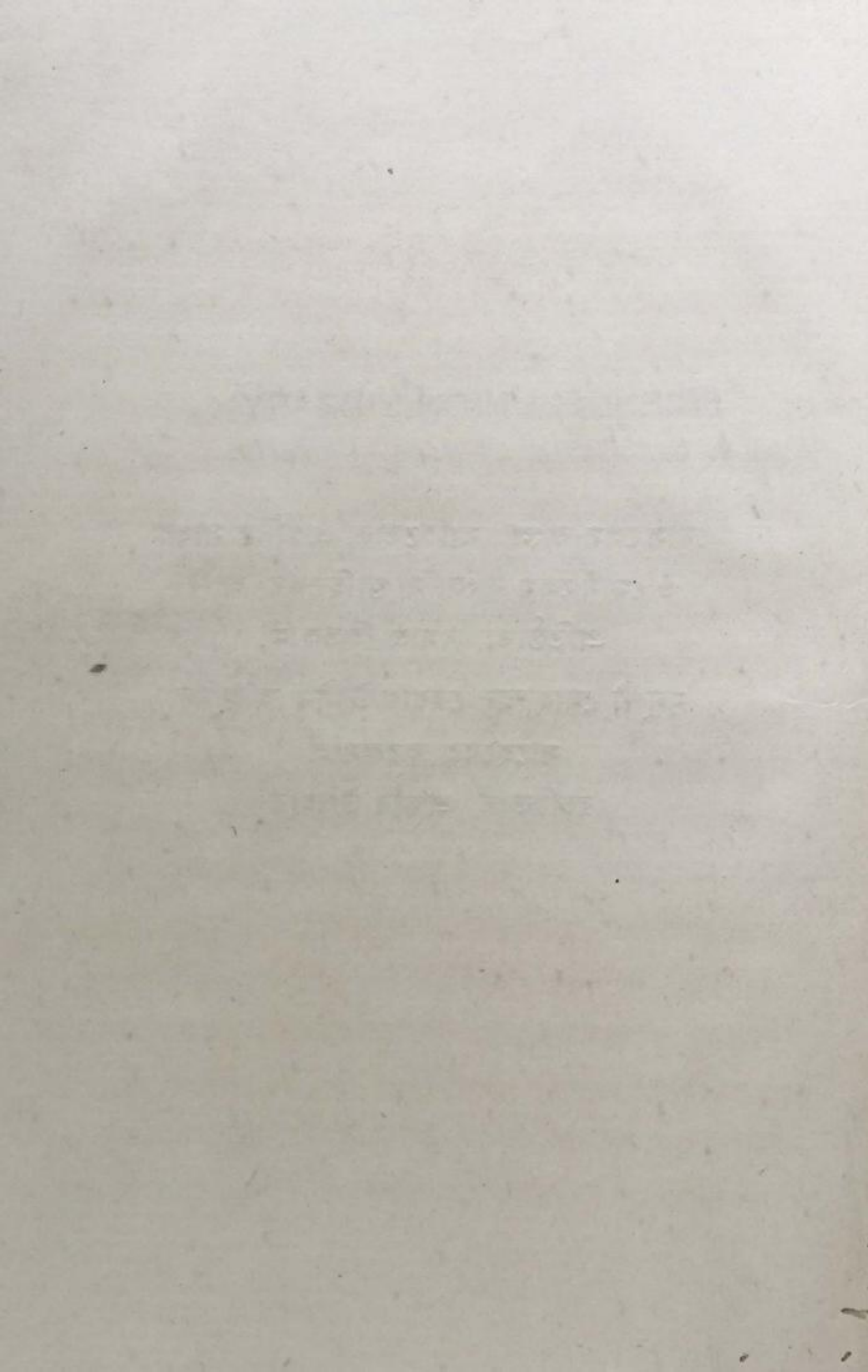
প্রথম পরিচ্ছেদ

——):*:(——

বহুদিন পুর্ব্বে বস্‌রার গোলাব-কুঞ্জে একটী সুগন্ধ গোলাব ফুল ফুটিয়াছিল। দরিদ্রের উদ্যানের গোলাব হইলেও আল্লা তাহাতে এত সৌরভ ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, আজ দ্বাদশ শত বৎসর পরেও তাহার সুবাস ও সৌন্দর্য্যে বিশ্ব ভরপুর হইয়া আছে এবং ভক্ত নরনারিগণ তাঁহার কথা অতি সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারণ করিতেছেন। বস্‌রার সেই শ্রেষ্ঠ গোলাবটিই জগৎ-বরেণ্যা তাপসী রাবেয়া।

যাঁহারা জগতের নানা জাতির ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে জগতের মঙ্গল কামনায় যাঁহারা নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া শেষে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভে সক্ষম হইয়াছেন এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজীবন দ্বারা জগতের দুঃখ ও পাপ বহুল পরিমাণে লাঘব

করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র মাতা-পিতার সন্তান। দারিদ্র্যের ক্লেশই তাঁহাদের চিত্তকে খোদাতা'লার দিকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হয় এবং এই কারণেই রাবেয়ার জীবনে ধর্ম্মের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

রাবেয়ার পিতা ইস্‌মাইল দরিদ্র কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বদাই নানা প্রকার অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। এমন কত দিন গিয়াছে যে তাঁহাদের আহার হয় নাই, এমন কত রাত্রি গিয়াছে যে তৈলের অভাবে তাঁহাদের গৃহে আলো জ্বলে নাই। যে দিন রাবেয়ার জন্ম হয়, সে দিনও ঘরে তৈল ছিল না। দরিদ্র হইলেও রাবেয়ার পিতা পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। স্ত্রীর কথা মত তিনি কিছু ছিন্নবস্ত্র ও তৈল সংগ্রহের জন্য প্রতি-বেশীদের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাহা চাহিয়া আনিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল না। অতএব রাজপুত্র বা রাজকন্যার জন্মের মত তাঁহার জন্মে কোন উৎসব হয় নাই, কোন রাজকবি তাঁহার বন্দনাগীত গায় নাই,—অতি অখ্যাত অজ্ঞাত ভাবেই এক অতি দীন-দরিদ্রের কুটীরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আল্লা যাঁহাকে বড় করিতে চাহেন, তাঁহাকে তিনি নির্জ্জনতা

হইতে জনতার মধ্যে টানিয়া আনেন, অন্ধকার হইতে শোভা-সৌন্দর্য্যময় আলোকের জগতে উপস্থিত করিয়া দেন। পৃথিবীর মানুষ আমরা তাহা জানিবারও অবসর পাই না। কিন্তু যখন সত্যই রহমান ও রহিম তাঁহাকে টানিয়া লইয়া সকলের অলক্ষিতে গৌরবের আসনে বসাইয়া দেন, তখনই তাহা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে-পুলকে আত্মহারা হই।

তাপসী রাবেয়ার জন্মের সহিত এক অতি আশ্চর্য্য কাহিনী জড়িত আছে। তাঁহার পিতা যখন প্রতিবেশীর দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া কিছু না চাহিয়াই ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি নিজের মন্দ অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষ যখন চিন্তায় ও যাতনায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে, তখন সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাই তাহার পদ্ম-হস্ত বুলাইয়া সেই ভাবনা ও যাতনার অবসান করে। আজ রাবেয়ার ক্লিষ্টচিত্ত পিতাকে সেই নিদ্রাই নিজ কোলে আশ্রয় দিয়া অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতে অবসর দান করিল।

তখন রজনী গভীরা। জীবজগত নিদ্রার কোলে অচেতন। উপরে তারকাখচিত নিশীথ আকাশ, নীচে বিপুলায়তনা পৃথ্বী আপনার দেহ বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে এবং প্রকাণ্ড দেহ দৈত্যের মত অন্ধকার তথায় রাজত্ব

করিতেছে। ঝিল্লীর নহবত ও দূরস্থিত সারমেয়ের রব কেবল সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ করিতেছে এবং বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া বায়ুর সর-সর ধ্বনি কদাচিত শ্রুত হওয়া যাইতেছে।

এমনি সময়ে রাবেয়ার পিতা এক মনোহর স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার দরিদ্রকুটীর আজ ধন্য হইয়াছে! পবিত্র আলোক ও শত সৌরভে সে গৃহ আজ ভরিয়া গিয়াছে! এবং সেই আলোক ও সৌরভের মধ্যে দাঁড়াইয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। সেই পবিত্র পুরুষ যেন রাবেয়ার পিতার প্রতি প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন এবং তাঁহার নয়ন ও বদন হইতে করুণার জ্যোতিঃ ক্ষরিত হইতেছে! মহাপুরুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বৎস, কেন তুমি এরূপ বিষণ্ণ হইয়াছ? তোমার এই কন্যা উত্তরকালে ধর্ম্মজগতে বহু পুরুষ সাধকের সমকক্ষা হইবে এবং তাহার যশঃ-সৌরভ বস্‌রার শ্রেষ্ঠ গোলাবের ন্যায় দিকে দিকে সুগন্ধ বিতরণ করিবে। তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। দারিদ্রের জন্য ম্রিয়মান হইও না, খোদাই তোমার দুঃখের অবসান করিবেন।—এই কন্যা হইতে তোমার বংশ চিরস্মরণীয় হইবে। বস্‌রার আমীর গত শুক্রবার তাঁহার নিয়মিত

দরুদ পাঠ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তুমি তাঁহাকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিবে যে, আমি তাঁহার সেই ক্রটীর প্রতিদান স্বরূপ তোমাকে চারিশত দিনার দিতে বলিয়াছি। আমীর ধর্ম্মপ্রাণ, তিনি তোমাকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিবেন না।”

হজরত ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইতেই রাবেয়ার পিতার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া বিস্ময়ে ও পুলকে কিছুকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার দীন-কুটীর যেন তখনও স্বর্গীয় সুবাসে পূর্ণ রহিয়াছে। যখন তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি হজরতের করুণায় মোহিত হইয়া খোদার অশেষ গুণানুবাদ করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে, স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমীরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন।

আমীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, এবং হজরত যে তাহার প্রতি কৃপা করিয়া এইরূপে তাঁহার ক্রটীর বিষয় তাঁহাকে জানাইয়াছেন, তজ্জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করিলেন এবং রাবেয়ার পিতাকে চারিশত দিনার এবং দরিদ্রদের মধ্যে দশ সহস্র দেরম বিতরণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

এই অর্থাগমে রাবেয়ার পিতার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তিনি এতদ্বারা নিজ পরিবারের দারিদ্র্য-ক্লেশ দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইহার ফলে সকলের মুখেই আনন্দের ও তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রাবেয়ার জন্মকাল হইতে তাঁহাদের পারিবারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায়, তিনি মাতার স্নেহে, পিতার আদরে ও ভগিনীদের যত্নে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

রাবেয়ার পূর্ব্বে এই পরিবারে আর তিনটি কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব রাবেয়া তাঁহার পিতার চতুর্থ সন্তান। আরবীতে "রাবা" শব্দে চতুর্থ বুঝায়। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার পিতার চতুর্থ সন্তান বলিয়াই তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছিল।

বালিকা রাবেয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। যে ধর্ম্মের আহ্বান তাঁহাকে পরবর্ত্তী জীবনে আকুল করিয়া তাঁহার সমস্ত সাধনা-কামনা আল্লার উদ্দেশ্যে অবিচলিত হৃদয়ে অর্পণ করিতে প্রবুদ্ধ করিয়া-ছিল, তখনও সে আহ্বান আসিয়া পঁহুছে নাই।

কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা আত্ম-দান করিয়া

চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনই অবিরাম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশেষে সর্ব্ববাঞ্ছনীয় সিদ্ধিস্থানে গিয়া পঁহুছিয়াছে। রাবেয়ার জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

——):#:(——

রাবেয়া যখন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। রাবেয়ার জন্মের পরে এই পরিবারে এই প্রথম শোকের ছায়া পড়িল।

দিন যেরূপ যাইতেছিল, সেইরূপই যাইতে লাগিল। সে কাহারও সুখ-দুঃখের পানে ক্ষণেকের জন্যও ফিরিয়া চাহিল না। কিন্তু দিন চলিয়া গেলেও অনেক সময়ে সে মানুষের মনে তাহার দাগ গভীর করিয়া আঁকিয়া রাখিয়া যায়। এই সময়ে রাবেয়ার জীবনে দুঃখের দিন সমাগত হইল। মাতার মৃত্যুর পরে পিতা জীবিত ছিলেন, বহু দুঃখের মধ্যে তাহা এক অসীম সান্ত্বনার বিষয় ছিল, কিন্তু সর্ব্বগ্রাসী কাল তাঁহাকেও হরণ করিল।

প্রবাদ আছে, দুঃখ কখনও একা আগমন করে না। তাই চারিদিক হইতে নানা মূর্ত্তিতে সে আবির্ভূত হইয়া এই তরুণীকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বস্‌রায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অনাবৃষ্টিতে

মাঠ-ঘাট তৃণশূন্য হইল, গোলাবের গাছ সকল ফুল-পত্রহীন হইয়া শুকাইয়া গেল! নয়নাভিরাম মনোরম ফলগুচ্ছ-শোভিত দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলি জলাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এমন যে পরীরাজ্যের রাজধানীর মত সুন্দর বস্‌রা নগরী, তাহা মরুভূমে পরিণত হইল!

দুঃখের সাথীই দুঃখ। রাবেয়ার ভগ্নিগণ প্রত্যেকেই প্রত্যেক হইতে এই সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, কেহ কাহারও সংবাদ রাখিতে পারিলেন না। সংসারানভিজ্ঞা সরলা রাবেয়া এই সময়ে জনৈক ক্রূর কুটিল লোকের হাতে পতিত হইয়া যে কত কষ্টভোগ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে তাহার দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু এইখানেই তাঁহার দুঃখ-জীবনের শেষ হয় নাই। কতিপয় দিবস পরে তিনি অন্যত্র বিক্রীত হইলেন।

রাবেয়ার এই নূতন প্রভু অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিল। তিনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও এই অত্যাচারীর তুষ্টিসাধনে সক্ষম হইতেন না। এক এক দিন পরিশ্রমে যখন তাঁহার দেহ-মন অবসন্ন হইয়া পড়িত, তিনি ভাবিতেন মৃত্যু বুঝি তাঁহাকে বরণ করিতে আসিতেছে। অবশেষে এই নৃশংস ব্যক্তির অত্যাচার এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, রাবেয়া

আর তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তখন এক রজনীতে তাঁহার প্রভুর নিদ্রাবস্থায়, তিনি আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া গোপনে তাহার গৃহ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু দ্রুতধাবনের ফলে হঠাৎ এক স্থানে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়া তাঁহার একটি হাত ভাঙ্গিয়া গেল।

সেই সময়ে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া যে প্রার্থনা আল্লার উদ্দেশ্যে উত্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক বাক্যে বিশ্বাসের জ্বলন্ত নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা খোদা-প্রেম প্রত্যাশী, তাঁহারা যে শত বিপদের মধ্যেও আপনার আরাধ্যকে শুধু মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন না, তাপসী রাবেয়ার প্রথম জীবনই তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থল। তখনও তিনি খোদার অনন্ত সত্বার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে পারেন নাই, কেবল সে পথের পথিকরূপে আয়োজন করিতে ছিলেন মাত্র।

ভগ্নহস্ত লইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইলেও রাবেয়া সেই বিপদের সময়ে আল্লা-পাককে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি তখন মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া একান্ত মনে প্রার্থনা করিলেন,—

"হে আমার খোদা, আমি এক নিঃসহায়া নারী। এ সংসারে আমার কেহ নাই। বিপদে পড়িয়া

আমি তোমাকেই ডাকিতেছি। তুমিই আমার সকল। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, প্রভো, তবে কে আমাকে গ্রহণ করিবে? প্রভো, আমাকে তোমার দ্বারের ধুলায় লুটাইতে দাও। নিরাশ্রয়া আমি, তোমার আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় পাইব নাথ? হে দয়াল খোদা, তুমি কি তোমার এই দাসীর উপরে বিরূপ হইয়াছ?"

চিরদিন ব্যথিতের ব্যথায় যাঁহার হৃদয় গলিয়া যায়, এই বিশ্ব যাঁহার অসীম দয়ার নিদর্শন, সেই রাব্বিল-আলামিন রাবেয়ার এই আকুল আহ্বানে স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাবেয়া শুনিতে পাইলেন, অদৃশ্য হইতে কে যেন বলিতেছেন,—

"রাবেয়া তুমি দুঃখ করিও না। মহাবিচারের দিনে তুমি এরূপ উচ্চাসন লাভ করিবে যে, ফেরেশ্‌তাগণ তোমার গৌরব ঘোষণা করিবে।"

খোদার এই বাণী শুনিয়া রাবেয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাহা হইলে তাঁহার খোদা তো তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই, বৃথাই তিনি আকুল হইয়াছিলেন! তাঁহার ক্ষুব্ধ ব্যথিত হৃদয় আজ এই বাণী হইতে বল সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের সাধনার জন্য প্রস্তুত হইল। যে হৃদয় কয়েক

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ভাবনা ও যাতনায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, সে হৃদয়ে এখন অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইল।

রাবেয়া খোদাতালাকে শত ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রভুর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এখন হইতে তিনি সারাদিন উপবাস ও সাময়িক উপাসনা এবং নিজ প্রভুর কাজ করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার মনিব তাঁহার উপরে যে কার্য্য ন্যস্ত করিত, তাহা তাঁহার সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু খোদার প্রতি ভক্তি তাঁহার হৃদয়ের একাগ্রতা এত বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের কঠোরতার বিষয় আর উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। দিনের কাজ শেষ করিয়া তিনি সমগ্র রজনী কেবল উপাসনাতেই নিযুক্তা থাকিতেন।

রাবেয়া এইরূপে ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু বাহিরে কেহই জানিতে পারিল না যে, কি আগুণে পুড়িয়া তাঁহার ভক্তিপ্রবণ হৃদয় কষিত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মপথের সাধক, তাঁহারা আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যান বলিয়াই জগতের সাধারণ মানবমণ্ডলী তাঁহাদিগকে সহজে চিনিতে পারে না, এবং সহজে যাহাতে কেহ চিনিতে না পারে ঠিক এইরূপ ভাবেই তাঁহারা আপনা-

দিগকে গোপন করিয়া রাখেন,— আত্মপ্রকাশ করিয়া কোন রূপেই সাধনার পথে বিঘ্ন ঘটাইতে চাহেন না।

নীরব নিশীথ। বিশ্ব যেন স্পন্দন রহিত। রাবেয়া নিজ গৃহে গভীর সাধনায় নিমগ্না। আজ যেন তাঁহার অন্তরের জ্যোতিঃ বহির্বিকাশ লাভ করিয়া খোদাতালার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অধিক চঞ্চল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! সে জ্যোতিতে প্রখরতা নাই, কিন্তু তাহার শান্ত মাধুর্য্যে যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিতেছে! আজ যেন আল্লা তাঁহার সাধনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সিদ্ধি প্রদান করিবেন!

প্রতিদিনের মত আজ যখন গভীর রজনীতে রাবেয়া সাধনায় আত্মহারা, তখন তাঁহার প্রভু জাগরিত হইয়া দেখিতে পাইল, রাবেয়ার গৃহ ভেদ করিয়া এক পরম জ্যোতিঃ অনন্ত আকাশের বায়ুস্তরের সহিত মিশিয়াছে! কি স্নিগ্ধ, মধুর সে জ্যোতিঃ! অথবা অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্র হইতে একটি ধারা যেন আজ রাবেয়ার সিদ্ধির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার শিরে আসিয়া পড়িয়াছে! সেই জ্যোতির প্রভায় সমগ্র গৃহ আলোকিত হইয়াছে! সেই পবিত্র আলোকের সাহায্যে গৃহস্বামী দেখিতে পাইল, রাবেয়া মস্তক ভূমিতে রাখিয়া কি যেন বলিতেছেন। বিশেষভাবে

মনঃসংযোগ করিয়া সে শুনিতে পাইল, রাবেয়া বলিতেছেন,—“প্রভু, তুমি জান তোমার আদেশ পালন করাই আমার অন্তরের একমাত্র কামনা। তোমারই সেবার জন্য আমি আমার আঁখির জ্যোতিঃ তোমার দ্বার-পথে ন্যস্ত রাখিয়াছি। আমি যদি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তও তোমার সেবা হইতে বিরত থাকিতাম না,—সর্ব্বক্ষণ তোমারই সেবায় আপনাকে নিয়োজিত রাখিতাম। কিন্তু হৃদয়-দেবতা, তুমি জান আমি পরাধীনা, তাই আমি এত বিলম্বে তোমার সেবায় উপস্থিত হই।”

রাবেয়ার এই আকুল প্রার্থনা শুনিয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধে এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া গৃহ-স্বামীর অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, না বুঝিয়া সে এই শুদ্ধপ্রাণা, পবিত্রস্বভাবা, ধর্ম্মশীলা রমণীকে সর্ব্বদা কত কষ্টই না দিয়াছে! রাবেয়ার মত নারী কি তাহার মত পাষণ্ডের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্তা?

রাত্রি প্রভাত হইলে, গৃহস্বামী রাবেয়ার নিকটে তাহার অতীত ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিল। রাবেয়া যে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, একথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ

ধর্ম্মই যাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের হৃদয় হিংসা-প্রতিহিংসার লীলাস্থল নহে।

এখন হইতে রাবেয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে খোদার চরণে ডালি দিলেন। অবিরত আরাধনাই এখন হইতে তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

——):*:(——

রাবেয়ার চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে, তিনি দিবসে সহস্র রাকাত নামাজ পড়িতেন। যে অনন্যসাধারণ খোদা-প্রীতি তাঁহাকে এই কষ্টসাধ্য ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত হইতে প্রবৃত্তি দান করিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তাঁহার সমস্ত চরিতালোচনা করিলে ইহাই দেখা যায় যে তিনি আল্লা ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না—তাঁহার জীবন সম্পূর্ণরূপেই খোদাময় হইয়া গিয়াছিল। কোন নারীই তাঁহার মত এইরূপ আকুল হইয়া পরমার্থ চিন্তা করেন নাই।

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন যে কোন দেশে যে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার সময় আসিয়া পঁহুছে, তখন সেই সেই দেশে সেই সেই বিষয়ের সাধকদের যেন বন্যা আসিয়া পড়ে। রাবেয়ার সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে বস্‌রারও সেই অবস্থা হইয়াছিল,—বস্‌রা তখন তাপসকুলের আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।

মহাত্মা হাসান রাবেয়ারই সমসাময়িক তাপস ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাপস হাসান তাঁহার মোরশেদ ছিলেন। হাসানের তপশ্চর্য্যা দর্শনে আপামর সাধারণ তাঁহাকে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি উপহার প্রদান করিত, এবং জ্ঞানবৃদ্ধগণ তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে সমবেত হইতেন। তাপসী রাবেয়াও মধ্যে মধ্যে এই শ্রেষ্ঠসাধকের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হইত।

মহর্ষি হাসান রাবেয়াকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সাপ্তাহিক ধর্ম্মোপদেশের সময় একদিন রাবেয়াকে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি কিছু বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। ইহাতে মণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "হজরত, এখানে তো বহু জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমন হইয়াছে, কেবল এক বৃদ্ধা নারী অনুপস্থিত আছেন, তাহাতে কি আসিয়া যায়?" মহাত্মা হাসান তাঁহার এই উক্তিতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেই বৃদ্ধা নারী যে কি তাহা তুমি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে? আমি অনেক যত্ন করিয়া হস্তীর জন্য যে সরবৎ প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা কোনরূপেই পিপীলিকার মুখে ধরিয়া দিতে পারি না।"

২

রাবেয়াকে যে তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তাঁহার এই বাক্য হইতেই তাহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবেই মহর্ষি হাসান যে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য রাবেয়ার মত আর কেহই বুঝিতে পারিতেন না, এবং সেই জন্যই রাবেয়া অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার হৃদয়ের উৎস খুলিত না। কথিত আছে যে, তাপস হাসান যখন উপদেশ প্রদান করিতে করিতে বাহ্যজগত হইতে অন্তর্জগতের মধ্যে আপনার অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতেন, তখন তিনি রাবেয়ার প্রতি চাহিয়া বলিতেন, "কল্যাণি, যে তেজ তুমি এখন আমাতে দেখিতেছ, ইহা তোমার হৃদয়ের তেজ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।"

রাবেয়া চির কুমারী ছিলেন। একদিন তাপস হাসান রাবেয়ার বিবাহে অভিরুচি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেহের সহিতই বিবাহের সম্বন্ধ, কিন্তু আমার দেহ কোথায়? আমি যে আমার দেহ-মন সবই আল্লার চরণে উপহার দিয়াছি। দেহ এখন খোদার, তাহা তাঁহার কার্য্যেই নিযুক্ত আছে।" রাবেয়ার আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে পারিয়াছিলেন। সে নারী কি সৌভাগ্যবতী যাঁহার জীবন আল্লারই কার্য্যে

উৎকৃষ্ট হয়! সে দেশ কি ভাগ্যবান যে দেশ এইরূপ মহীয়সী নারীর জন্মভূমি বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে!

রাবেয়ার প্রতি কার্য্যে, প্রত্যেক কথার মধ্যে আমরা খোদার প্রতি তাঁহার অসীম বিশ্বাসের নিদর্শন প্রাপ্ত হই। রাবেয়া কিরূপে খোদাকে পাইয়াছেন, মহর্ষি হাসান একদিন তাঁহাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তরে বলেন যে, তিনি তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াই তাঁহাকে পাইয়াছেন।

রাবেয়া কাহারও শিষ্যা না হইয়া কেবল নিজ সাধন-বলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। যে নারী-জাতিকে অনেকেই সাধনপথের বিঘ্ন মনে করেন, রাবেয়া সেই নারী-জাতিরই একজন হইয়া অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সর্ব্ববাঞ্ছনীয় সিদ্ধিস্থানে গিয়া পঁহুছিয়াছিলেন, নারীর পক্ষে ইহা হইতে গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? খোদা রাবেয়াকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র নারী-জাতিকে সম্মানিত করিয়াছেন।

একদিন মহর্ষি হাসান ও রাবেয়া ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে হাসান বলিলেন, "রাবেয়া, আমার মৃত্যুর পরে যদি আমি ক্ষণমাত্র খোদার কথা ভুলিয়া অন্য কথা ভাবি, তাহা হইলে আমি এরূপ বিলাপ করিব যেন

আমার প্রতি ফেরেশ্‌তাগণের দয়া হয়।" রাবেয়া বলিলেন, "তাপস প্রবর, আপনি যাহা বলিলেন তাহাতো অতি উত্তম কথা। কিন্তু জীবনে যদি মুহূর্ত্তমাত্র খোদার প্রসঙ্গ হইতে আপনার মন অন্য দিকে ধাবিত হয়, এবং তজ্জন্য আপনার হৃদয়ে অনুতাপের অনল জ্বলিয়া উঠে, তবেই কেবল বুঝা যাইবে যে মরিলেও আপনার সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইবে না।" খোদার চিন্তা যে রাবেয়ার মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল, তাহার এই সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন উক্তি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা নিতান্তই ভক্তির কথা, ইহাতে অহমিকার লেশ মাত্র নাই।

রাবেয়ার ধর্ম্মপ্রাণতা ও খোদার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা যে কোনও পুরুষসাধক হইতে বিন্দু পরিমাণেও হীন ছিল না, বরং তিনি যে আদর্শ-স্থানীয়া ছিলেন, তাহার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক বাক্য হইতেই তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়।

যাহারা ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া, অবহেলা করিয়া সুখ পায়, তাহারা রাবেয়ার ধর্ম্মপ্রাণতাকে অন্ধবিশ্বাস বলিতে পারে, কিন্তু যে অগণিত নরনারী ধর্ম্মকে জীবনের সারপদার্থ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা রাবেয়ার চরিতালোচনায় যে শান্তি ও সুখের সন্ধান পান, তাহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

——):#:(——

রাবেয়ার ধর্ম্মজীবনের অদ্ভুত কাহিনীনিচয় তখন দেশে দেশে প্রচারিত হইয়াছে। এক নারী পুরুষের অসাধ্য যাহা, তাহা সাধন করিয়াছেন, এই কথাই সকলের মুখে তখন বিস্তৃতিলাভ করিতেছে এবং দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতেছেন। একবার এইরূপ দুইজন লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতেছিলেন যে, হজরত রাবেয়া যদি তাঁহাদিগকে কিছু খাইতে দিতেন, তবে বড় ভাল হইত।

রাবেয়ার নিকটে তখন মাত্র দুইখানা রুটী ছিল। তিনি তাহা বাহির করিয়া কিরূপে যে তদ্দারা অতিথি সেবা করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়ে এক ভিক্ষুক বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "মা, আমি দরিদ্র ভিক্ষুক, ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছি। কিছু খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারি কি ?"

রাবেয়া ক্ষুধার্ত্তের প্রার্থনা শ্রবণ মাত্র রুটী দুইখানা তাহাকে প্রদান করিলেন—নিজের জন্য বা অতিথিদের জন্য কিছুই রাখিলেন না। অতিথিদ্বয় ইহাতে বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই এক পরিচারিকা কয়েক-খানা সদ্যপ্রস্তুত রুটীসহ উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, তাহার কর্ত্রী উহা তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন। রাবেয়া তখন রুটী কয়খানা গণিয়া দেখিলেন এবং তাহার পরে উহা পরিচারিকার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "না ইহাতো আমার জন্য নয়। তুমি হয়তো ভুল করিয়াছ।"

রুটী সংখ্যায় অষ্টাদশ খণ্ড ছিল। পরিচারিকা বলিল, "আমার প্রভুপত্নী আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এই রুটী আপনাকেই দিতে হইবে!" রাবেয়া বলিলেন, "না না, ফিরাইয়া লইয়া যাও, নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে।"

পরিচারিকা রুটীসহ ফিরিয়া গিয়া নিজ স্বামিনীর নিকট সকল কথা নিবেদন করিল। তিনি তখন রুটী কয়খানা গণিয়া উহাতে আরও দুইখানা রুটী যোগ করিয়া দিয়া বলিলেন, "এইবার ইহা ঠিক হইয়াছে, তুমি এখনই ইহা তথায় লইয়া যাও।"

পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া রাবেয়ার হাতে রুটী

কয়খানা দিলে তিনি তাহা গণিয়া দেখিলেন এবং ঠিক হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই রুটী দিয়াই তিনি অতিথি সেবা করেন।

অতিথিদ্বয় রাবেয়ার এই ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিতান্ত বিনয়ের সহিত তাঁহার নিকটে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তাঁহারা যে ক্ষুধার্ত্ত, ইহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মাত্র দুইখানা রুটী ছিল। কিন্তু দুইখানা রুটি দিয়া কি ভাবে যে অতিথিসেবা করিবেন, তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে ভিক্ষুক আসিয়া খাদ্যপ্রার্থী হইল। তিনি তখন রুটি দুইখানা তাহাকেই দিয়া খোদার নিকটে প্রার্থনা করেন,—"প্রভু তুমি বলিয়াছ, যে যাহা দান করে, সে তাহার দশগুণ পায়। আমি তোমার এই বাণী সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করি এবং তজ্জন্যই তোমাকে তুষ্ট করিবার মানসে গৃহে দুইজন অতিথি বর্ত্তমান থাকিতেও ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে আমার একমাত্র সম্বল রুটী দুইখানা প্রদান করিয়াছি।" ইহার পর, দাসী অষ্টাদশখণ্ড রুটি লইয়া উপস্থিত হইল। তিনি উহা গণিয়া দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, ইহাতো কখনও হইতে পারে না। খোদা যাহা

বলিয়াছেন, তাহা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা হইবার নয়। তাই তিনি গণনায় ভুল হইয়াছে বলিয়া রুটি ফিরাইয়া দেন। গৃহস্বামিনী পরে আরও দুইখণ্ড রুটি দিয়া সংখ্যা পূরণ করিয়া দেওয়াতেই তিনি উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

রাবেয়ার এই ধ্রুব বিশ্বাসই তাঁহাকে ধর্ম্মজগতে এত বড় করিয়াছিল। আমরা কত সময়ে কতবার খোদার বাণীতে, দয়াতে, অবিশ্বাস করিয়া ভুল করি, পাতকী হই! জগতের নরনারী যদি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে খোদার বাণীকে রাবেয়ারই মত সম্বল করিতে পারিত, তবে পৃথিবী পবিত্রতার স্থান হইত এবং পৃথিবী হইতে পাপ, তাপ চিরকালের জন্য লোপ পাইত!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

——):*:(——

একদিন তাপসী রাবেয়া প্রকৃতির শোভা ও সম্পদ দৃষ্টি করিবার জন্য পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বহু পশুপক্ষী চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে পরমাত্মীয়ের মত বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন, আর এক পথ দিয়া তাপস হাসান তথায় উপস্থিত হইতেই উহারা দূরে সরিয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া তাপস হাসান বলিলেন, "রাবেয়া, উহারা কেমন নির্ভীকচিত্তে তোমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর আমি আসিতেই দৌড়িয়া পলাইল।" রাবেয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আপনি কি খাইয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "গোশ্‌ত ও রুটি!" তখন রাবেয়া বলিলেন, "ইহা মন্দ কথা নয়; আপনি তাহাদের মাংসে উদর পূর্ণ করিবেন, আর তাহারা নির্ভয়ে আপনার কাছে আসিবে? এমন কখনও কি হয়?"

রাবেয়ার জীবন অলৌকিক ঘটনাময়। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাকে বলিতে-

ছেন, "রাবেয়া, তুমি আমাকে কি তোমার বন্ধু বলিয়া মনে কর না?" তখন রাবেয়া বলিলেন, "হজরত, আপনার বন্ধুত্ব কাহার না বাঞ্ছনীয়? কিন্তু খোদার প্রতি ভালবাসা আমার হৃদয় এমন করিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, আমি তথায় আর কাহারও বন্ধুত্ব বা শত্রুতার জন্য স্থান দেখিতেছি না।"

এই নারীতে খোদাতা'লা কি অসীম ভক্তির ভাবই দিয়াছিলেন! তাই তিনি খোদাকে এমন প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে আর কাহারও জন্য একটুকু স্থানও ছিল না। এই যে প্রেম ইহা তুলনা রহিত, ইহা কামনাহীন, বাসনাহীন,—ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয় প্রভায় ভাস্বর!

রাবেয়ার প্রেম কাল-বিজয়ী ছিল। কেহ তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই উত্তরই দিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার মত সর্ব্বস্ব দিয়া কয়জন খোদাতে এইরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন? জীবনে তাঁহার আর কিছু কাম্য ছিল না, আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল না, কেবল আল্লাকে পাওয়াই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তিনি যে তাঁহাকে পাইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় তাহা স্ফূটতর হইয়া রহিয়াছে!

একদিন রাবেয়াকে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, কোন পাপী যদি অনুতপ্ত হয় এবং আর পাপ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে, তবে তাহা গ্রাহ্য হইবে কি না। ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, খোদা পাপীকে অনুতপ্ত হওয়ার উপযুক্ত মনে না করা পর্য্যন্ত সে কখনও অনুতপ্ত হইতে পারে না। সময় আসিলে আল্লা তাহার সকল নিবেদনই গ্রহণ করেন। মুখে অনুতপ্ত হওয়া কিছুই নয়। যাহার হৃদয় অনুতাপের অনলে পুড়িয়া ছাই হইয়া পবিত্র হয়, বাহিরের লোককে দেখাইবার প্রবৃত্তি তাহার লোপ পায়, কারণ তখন সে চিন্ময়ের সন্ধান পাইয়া পার্থিব সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জয়-পরাজয়ের অতীত হইয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

——):*:(——

তখন বসন্তকাল। গোলাবের রাজ্য বস্‌রায় বসন্তের আগমন এক বিচিত্র, বিপুল, আনন্দজনক ব্যাপার। কুঞ্জে কুঞ্জে কণ্টকিত শাখে সবুজ পাতার বেষ্টনীর মধ্যে নানা রঙ্গের নানা রকম গোলাবের তখন কি বাহার! কেবল ফুলই যে ফুটিয়াছে তাহা নহে, মন্দ পবন ফুটন্ত ফুলের বুক হইতে সুবাস হরণ করিয়া লুব্ধ-হৃদয়ে দিকে দিকে বিতরণ করিতেছে, আর চারিদিকের শ্যামায়মান তরু-শ্রেণী হইতেও যেন একটা সজীবতার আভা, যৌবনের আভা, বসন্তের আভা. মুক্তভাবে প্রকৃতির দেহে ক্রীড়া করিতেছে! এমন সময়ে কাহার হৃদয় না উৎসবের উল্লাসে, আনন্দের হিল্লোলে নাচিয়া উঠে?

রাবেয়ার এক সেবিকা ছিল। বসন্তের এই বিপুল শোভা দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। সে তখন রাবেয়াকে ডাকিয়া বলিল, "হজরত, একবার বাহিরে আসিয়া দেখুন, বসন্তের আগমনে প্রকৃতি আজ কি মোহন বেশে সাজিয়াছে!"

রাবেয়া তখন কুটীরের ভিতরে ছিলেন, সেবিকার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বাহিরে গিয়া আমি পৃথিবীর ক্ষণিকের শোভা ও সম্পদ কি দেখিব? তুমি ভিতরে আসিয়া যিনি পৃথিবীতে এই বসন্তের সূচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া যাও। সে রূপ তুলনা রহিত, বাক্য ও মনের অতীত!" এই জ্ঞানবতী ধর্ম্মশীলা সন্ন্যাসিনীকে পাইয়া জগৎ প্রকৃতই একদিন ধন্য হইয়াছিল এবং তাঁহার হৃদয়ে যে চির-বসন্তের শোভা বিদ্যমান ছিল, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

পৃথিবীর নশ্বরতার কথা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। আল্লাতে আত্মসমর্পণ করার ফলে তাঁহার অন্তর অবিনশ্বর প্রেমেই ভরপুর ছিল। তিনি দুঃখ দারিদ্র্যের অতীত ছিলেন। ইহার কিছুতেই তাঁহার মনে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হইত না।

একদিন হাসান বস্‌রী রাবেয়াকে দেখিবার জন্য তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বস্‌রার এক ধনবান বহু ধন লইয়া রাবেয়ার দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাপস হাসান ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, বিবি রাবেয়ার জন্য তিনি কিছু অর্থ উপহার আনিয়াছেন, কিন্তু তিনি সংসার-বিরাগিনী,

তাহাতে ভয় হয় যে তিনি বা তাঁহার এই সামান্য পার্থিব উপহার গ্রহণ না করেন। ধনবান হাসান বসরীকে তাঁহার হইয়া রাবেয়ার নিকট অনুরোধ করিতে বলিলেন।

ইহার পর মহর্ষি হাসান গৃহের ভিতরে গেলেন এবং রাবেয়ার নিকটে সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। একজন সংসার-ত্যাগীর নিকটে ধনের আলোচনা শুনিয়া তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "তাপস, আপনি দেখিয়াছেন, কত লোক সমগ্র জীবনে সৃষ্টিকর্ত্তার কথা স্মরণওকরে না, কত লোক অবিরত তাঁহার নিন্দা করিয়া রসনা কলুষিত করে, আবার কেহ বা তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে অবিরত দণ্ডায়মান হয়। তথাপি খোদা এমনই দয়ালু যে তাহাদের ত্রুটির কথা ভুলিয়া গিয়া প্রতিদিন তাহাদের আহার যোগাইয়া থাকেন। আর তাঁহার যে ভক্তের হৃদয়ে একমাত্র তাঁহার প্রেম ছাড়া অন্য কিছু স্থান পায়না, যে নিজের যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাতেই সঁপিয়া দিয়া রিক্তহস্ত হইয়াছে, তিনি কি তাঁহার সেই প্রেমাধিনীকে খাদ্য ও পানীয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন? যখন হইতে আমি তাহাকে জানিয়াছি, তাঁহাকে নিজ স্বামীরূপে, বিশ্বপতিরূপে, ভাবিতে শিখিয়াছি, সেই দিন হইতে ত আমার আর কিছুরই অভাব নাই। অতএব আমি এই ধন গ্রহণ করিয়া আমার খোদার নিকট দোষী হইতে পারিনা।"

রাবেয়া অনন্যসাধারণ তেজস্বিনী নারী ছিলেন। একবার কয়েকটি লোক রাবেয়ার হৃদয়ের শক্তি পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রাবেয়াকে বলিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু গুণ আছে পুরুষগণই তাহা পাইয়াছে, নারিগণ কিছুই পায় নাই। অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়া পুরুষেরাই জগত স্তম্ভিত করিয়াছে, কোন স্ত্রীলোক তাহা পারে নাই, তবে আপনার এত তেজ কোথা হইতে আসিল?" রাবেয়া বলিলেন, "তাহা ঠিক বটে, কিন্তু তোমরা কি এমন একটি নারীর নাম করিতে পারিবে যে তোমাদের পুরুষ জাতির মত আপনার জ্ঞানের গরিমায় অহঙ্কৃত হইয়া সকলকে বলিয়াছে, আমি খোদা, তোমরা আমারই পূজা কর? কাপুরুষতা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয়, তাহা তোমাদেরই অঙ্গের ভূষণ!"

নারী যে শুধু নারী নহে, সে যে দেবী, সে যে আমাদেরই মাতৃ-জাতি, একথা আমরা যে সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই, তাহাতে কি কোন সংশয় আছে? দেশ-সেবায় বল, ধর্ম্ম-সেবায় বল, নারীর মত প্রাণঢালা সেবা আর কেহ কি কখনও করিতে পারিয়াছে? নারী যখন দেয়, তখন সে কিছু বাকী রাখিয়া দেয় না, যথাসর্ব্বস্বই দেয়। যে দিন আমরা শিশুরূপে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই, সেই দিন হইতে

আমরা মায়ের বুকের সকল স্নেহই কাড়িয়া লই, তিনি আমাদিগকে কিছুই দিতে বাকি রাখেন না। সেই দিন হইতেই আমরা নারীর মহত্ত্বের সহিত পরিচিত হই। নারীর মহত্ত্বে যে পুরুষের সমস্ত জীবন আলোকিত, একথা কে না স্বীকার করিবে ?

রাবেয়া কামনাশূন্য হইয়াই খোদার এবাদত করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কোণেও একটু আকাঙ্ক্ষার কণা থাকিত না। সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম যাহা চিত্তবিজয়ে সক্ষম হয় এবং মানুষকে সম্পূর্ণরূপে খোদার মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। কত দিনের কত ঘটনায় রাবেয়ার এই কামনাশূন্য খোদাপ্রেম বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আমরা তৎসম্পর্কে একটি ঘটনার মাত্র উল্লেখ করিব।

এক দিন রাবেয়া নিজ কুটিরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কয়েকজন ধর্ম্মার্থী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন কথা প্রসঙ্গে রাবেয়া তাঁহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি জন্য তিনি খোদার এবাদত করেন ? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি নরকের অশেষবিধ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই খোদার ভজনা করিয়া থাকি !" আর একজন বলিলেন, "বেহেশ্ ত বড় সুন্দর স্থান, তথায় চিরসুখ বর্ত্তমান। কওসরের অমৃত ধারায় তথাকার

অধিবাসীবৃন্দ পিপাসা নিবারণ করে, তথায় সুবর্ণতরুর পাতায় পাতায়, ডালে ডালে, হীরক-চুনি-পান্নার কি বাহার ! সেই তরুতলে বসিয়া চিরবসন্তের রাজ্যে হুরের সেবালাভ নিতান্তই লোভনীয় ! সেখানে দুঃখ নাই, যন্ত্রণা নাই, কেবলই সুখ, এই সুখের আশায়ই আমি খোদাকে ডাকিয়া থাকি।”

রাবেয়া বলিলেন, “তোমরা নিতান্তই অধম। তোমাদের একজন নরকের যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য, আর একজন পৃথিবীর নিকৃষ্ট আদর্শানুযায়ী স্বর্গ-সুখের আশায় জগৎকর্ত্তার সেবা করিয়া থাক, কিন্তু কেহই ত তোমরা আকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার সেবায় আত্মসমর্পণ কর নাই ! যে সাধনা কামনাহীন নয়, যাহাতে লাভের আশা থাকে, যাহাতে আমিত্বের সত্ত্বা পূর্ণ বিরাজিত, তাহা ত সেবায় পরিগণিত হইতে পারে না। যদি স্বর্গ ও নরক বলিয়া কিছু না থাকিত, তবে কি কেহ স্রষ্টার সেবা করিত না ? তাঁহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া সেবা করিতে হইলে নিজেকে ভুলিতে হইবে, নিজের সকল বাসনা কামনা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তবে ত তিনি সেবকের প্রতি সদয় হইবেন ! খোদার প্রেম পণ্যদ্রব্য নয়, ইহা সেবা দ্বারা লাভ করিতে হয়।” যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত তাঁহারা

৩

প্রবৃত্তিহীন হইয়াই তাঁহাকে পাইবার জন্য জীবন-ব্যাপী সাধনায় নিযুক্ত হন এবং যেদিন তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হয়, সে দিন তাঁহাদের এমন কিছু থাকেনা যাহা তাঁহারা আপন বলিয়া দাবী করিতে পারেন; কারণ তখন তাঁহারা সর্ব্বস্ব খোদাকে সমর্পণ করিয়া খোদাময় হইয়া যান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

——):*:(——

তীর্থস্থান দর্শন ইস্‌লাম ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ, ইহাতে ধর্ম্ম সজীবতা লাভ করে। মুসলমানদের মধ্যে পবিত্রভূমি মক্কা, মদিনা ও বয়তুল-মোকাদ্দাস শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। পূর্ব্বে কেবল কাবা মন্দির ও আরাফাত প্রান্তরের হজের জন্য মক্কার তীর্থ বিখ্যাত ছিল। কিন্তু ইস্‌লামের শেষ প্রবর্ত্তক দীন-জন-শরণ, প্রিয়দর্শী, সত্যকাম হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্মভূমি ও প্রথম প্রচারক্ষেত্র বলিয়া শেষে ইহা অধিক বিখ্যাত হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানই উহা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয় এবং জীবনে কুলাইলে ইহার ধুলায় লুটাইয়া নিজের জীবন ধন্য করে।

শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 'এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য নাই' এই মহামন্ত্র যখন জলদনির্ঘোষে মক্কার চারিদিকে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন পথ-ভ্রষ্টের দল তাঁহাকে সহস্র প্রকার নির্য্যাতন করিতে লাগিল। সেবকমণ্ডলির মধ্যে অনেকেই সেই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ধর্ম্ম রক্ষার্থে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

কিন্তু হজরত আবু বকর, ওমর, ওস্‌মান ও আলী প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সহচর কোনরূপেই তাঁহার সাহচর্য্য ত্যাগ করিলেন না। হজরত আশ্রয়ের আশায় তায়েফে গিয়াছিলেন, কিন্তু তথাকার অকৃতজ্ঞের দল তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া, অবহেলা করিয়া, নির্য্যাতন করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে,—তাহারা ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। এমন সময়ে ইস্‌লামকে রক্ষার জন্য এক স্থানের লোকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! ইয়াসরাবের অধিবাসীবৃন্দ এই সময়ে হজরতকে তাঁহাদের সহিত বাস করার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। হজরত সেই নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি চিরসুহৃদ আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া মক্কা ত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতে "ইয়াস্‌রাব" এই পুরাতন নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার নূতন নাম হইল 'মদিনাতুন্নবি'—তত্ত্বাহকের নগর। সেই যে মদিনার সহিত পবিত্রতার সংযোগ হইয়াছে, তাহা চিরস্থায়ীরূপে মোস্‌লেমজগতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। এই খানেই হজরতের রওজা মবারক বর্ত্তমান থাকায় ইহার পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহার পর বয়তুল মোকাদ্দাস। ইহার অণুপরমাণুতে যে কত নবীর দেহ মিশিয়া রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে

করিবে? হজরত সোলেমান এইখানেই তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে 'এক ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য নাই' এই মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। হজরত ঈসা এই স্থানেই 'ইস্‌লামের' মূলতত্ত্ব অবিশ্বাসীদের কাছে বিবৃত করিতে গিয়া বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। এসিয়ামাইনরের এমন স্থান নাই, যেখানে কোন তত্ত্ববাহকের জন্ম হয় নাই। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোক বলিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি-গাথা আজ লোপ পাইয়া গিয়াছে! তবু মুসলমানগণ তাঁহাদের স্মৃতির উপর ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন। এই পুণ্য ভূমিতে যে হজরত দাউদ, ইব্রাহিম ও মুসার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা কোন্ মুসলমান ভুলিতে পারে? তাই ইহার মাটি মুসলমানের নিকট এত পবিত্র! যেমন মক্কায় মস্‌জিদ্‌ল হারাম, মদিনায় রওজা মবারক, তেমনি বায়তুল-মোকাদ্দসে মসজিদ-আল্‌-আক্‌সা স্বীয় নাম মাহাত্ম্যেই চিরপবিত্রতার আসন অধিকার করিয়া আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থ-দর্শন ইস্‌লামের একটি প্রধান অঙ্গ, তাই তাপসী রাবেয়া মক্কাতীর্থে যাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিজের যে একটী জীর্ণ গর্দ্দভ ছিল তাহাতেই আরোহণ করিয়া পবিত্র ধামের

যাত্রী হইলেন! সত্য ও পবিত্রতা যাঁহার জীবনের চিরসাথী, তিনি যে তীর্থ দর্শনেউৎকণ্ঠিতা হইবেন; ইহাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই।

কিন্তু ভক্তাধীন খোদাতা'লা ভক্তের সহিতই অপরূপ খেলা খেলিয়া থাকেন। মরুভূমিতে পঁহুছামাত্রই রাবেয়ার গর্দ্দভটি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। শত চেষ্টায়ও তাহার যে জীবন আছে এমত বুঝা গেল না। তিনি যে যাত্রিদলের সহিত চলিয়া ছিলেন, তাহাদের অনেকেই তখন তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি ত তোমাদের ভরসায় আসি নাই। যাঁহার ভরসায় আসিয়াছিলাম, তিনি যখন আমার ন্যায় একটি নিঃসহায়া বৃদ্ধা নারীর সহিত এইরূপ খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আমি কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখি না। তোমরা আমাকে ছাড়িয়াই চলিয়া যাও।"

তখন অনন্যোপায় যাত্রীর দল তাঁহাকে সেই জনহীন প্রান্তরে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল,—তিনি তথায় একাকিনীই পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু রাবেয়ার প্রকৃতিই এইরূপ ছিল যে, কি বিপদে কি সম্পদে তিনি কখনও তাহার জীবন-স্বামীকে ভুলিতেন না। তাঁহার সকল মান

অভিমান তিনি খোদার নিকটেই নিবেদন করিতেন। বর্ত্তমান অবস্থায়ও তিনি সেই পথ হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হইলেন না। রাবেয়া খোদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"হে সর্ব্বশক্তিমান বিরাট পুরুষ, তুমি ত জান—আমি এক বৃদ্ধা নারী,—গুণহীনা, শক্তিহীনা, তবে তুমি আমার সহিত একি খেলা খেলিতেছ? আমি কি তোমার খেলার যোগ্যা? আল্লা, তুমি নিজেই আমাকে তোমার গৃহের দিকে আহ্বান করিয়াছ, আর আমি যখন এই জনহীন প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি, ঠিক সেই সময়ে তুমি আমার একমাত্র সম্বল বাহনটির প্রাণ হরণ করিলে? আমাকে এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিতে কি তোমার একটুও কষ্ট হইল না? এ কি তোমার দয়া প্রভু?"

চিরদিনই দেখা গিয়াছে,—খোদা কখনও তাঁহার ভক্তের ডাক অবহেলা করিতে পারেন নাই। সর্ব্বধর্ম্মের ইতিহাসেই তাহার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই রাবেয়ার এই তিরস্কারে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। গর্দ্দভটির প্রাণহীন দেহে তখনই প্রাণের সঞ্চার হইল, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল! সে যেন তাহার যৌবনের তেজ ও শক্তি আবার ফিরিয়া পাইল! ইহার পর বিবি রাবেয়া হৃষ্টচিত্তে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়া অনতিবিলম্বে সহযাত্রি

গণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাহারা এই লোকাতীত দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

——):*:(——

আরবের মরুভূমি, কেবলই বালুকার স্তরের পর বালুকার স্তর,—যেন তরঙ্গায়িত সমুদ্র স্থির হইয়া আছে! বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ফুল নাই, ফল নাই, বিচিত্র সে কঠোর প্রাকৃতিক দৃশ্য! যেদিকে নয়ন ফিরাও, কেবলই অনন্ত বালুকারাশি সৌরকিরণে রূপার ন্যায় ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে! তথায় পিপাসাতুরের জন্য এক বিন্দু পানি পাওয়াও সুদুর্ল্ভ। দূর হইতে খর্জ্জুর বৃক্ষের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে হইবে, সে স্থানে বুঝি পানি আছে, কিন্তু সারা দিন ছুটিলেও আশার পূরণ হইবে না, মরীচিকা দূরেই থাকিবে। এই মরুভূমি তাই বসতি শূন্য। বিরাট বিশ্বের বুকে কঠোরতার এমন প্রকট ছবি আর কোথাও নাই! কিন্তু তাই বলিয়া আরবের সর্ব্বত্র এইরূপ শ্মশান নয়, স্থানে স্থানে এই কঠোরতার ভিতরেও কমনীয়তা লুক্কায়িত আছে, দেখা যায়। স্রষ্টা তাঁহার এই ঊষর সৃষ্টির মধ্যে মরূদ্যানের রচনা করিয়া আপনার মহিমা প্রচার করিয়াছেন।

কয়েক দিন পথ চলার পর হজযাত্রিগণ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মক্কার সন্নিহিত হইলেন। সকলে হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশ করিল, কিন্তু রাবেয়া প্রান্তরেই রহিয়া গেলেন। সেই সময়ে তিনি প্রার্থনা করিতেন, "এলাহি, আমি কোথায় চলিয়াছি? আমি ত একমুষ্টি ধূলি মাত্র, আর কাবামন্দির প্রস্তরের স্তূপ বই ত আর কিছুই নহে, তোমাকে পাওয়াই আমার হৃদয়ের কামনা! তোমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষাতেই আমি এখানে আসিয়াছি।"

আকাশ বাতাস মথিত করিয়া তখন ধ্বনি হইল, "কি চাও তুমি রাবেয়া? তোমাকে অদেয় ত আমার কিছুই নাই। তুমি কি জান না যে, মুসা আমার দর্শন প্রয়াসী হইলে, আমি আমার অনন্ত জ্যোতির এক কণিকামাত্র পাহাড়ের উপর স্থাপিত করিয়াছিলাম, তাহাতে সেই পাহাড় তাহা ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল; আর মুসা সেই পরম জ্যোতিঃ দর্শনে চল্লিশ দিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিল?"

বিশ্বদেবতার এই বাণী শুনিয়া রাবেয়া প্রফুল্লচিত্তে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং যথাবিধি হজব্রত উদ্‌যাপন করেন।

ইহার পর তিনি আর একবার হজব্রত সমাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাল্‌খের অধিপতি রাজর্ষি

ইব্রাহিম আদ্‌হামও উক্ত ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, রাজর্ষি ইব্রাহিম * তাঁহার জন্মভূমি হইতে পদব্রজে মক্কাযাত্রা করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরে পবিত্র ধামে পঁহুছিয়া ছিলেন এবং পথিমধ্যে প্রতি পদক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়াছিলেন। আমাদের ভাবিতেও

---

* ইঁহার সংসার ত্যাগের কাহিনী অতি বিস্ময়জনক। বাল্‌খের আমীর ইব্রাহিম বিন আদ্‌হাম একদিন প্রাসাদের পর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন। রাত্রি নিশীথ, এমন সময়ে কাহার পদশব্দে যেন প্রাসাদের ছাদ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এমন সময়ে ছাদে বিচরণ করিতেছে?" উত্তর আসিল, "শত্রু নই, উষ্ট্র হারাইয়াছি, তাহারই সন্ধান করিতেছি।" ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "অট্টালিকার ছাদের উপরে উষ্ট্রের সন্ধান, সে কিরূপ কথা?" ছাদে যিনি ছিলেন, তিনি বলিলেন, "তুমি যে বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া, স্বর্ণময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া খোদার অন্বেষণ কর, সে ব্যাপার হইতে কি আমার এই ছাদে উষ্ট্রান্বেষণ বেশী বিস্ময়জনক?" বক্তা ইহা বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার মন প্রকৃত শান্তির অন্বেষণে ব্যগ্র হইল।

উপরের ঘটনার পর আরও কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। ইব্রাহিম বিন আদ্‌হাম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতেছেন, এমন সময়ে এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। আমীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চান?" তিনি বলিলেন, "এই পান্থনিবাসে আসিলাম, কিছুক্ষণ

রোমাঞ্চ হয়, কি কঠোর সাধনা দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতের বরেণ্যদের মধ্যে একজন হইয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বৈরাগ্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়! দুইজনই রাজৈশ্বর্য্যের মোহিনীমায়া পরিত্যাগ করিয়া পথের ধুলায় আপনাদিগকে লুটাইয়া দিয়া বিশ্বদেবের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন!

———

এখানে থাকিয়া একটু বিশ্রাম করিব।" ইব্রাহিম বিন আদ্‌হাম বলিলেন, "ইহা পান্থশালা নয়, রাজ-প্রাসাদ।" আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি তুমিই চিরদিন বাস করিয়া আসিতেছ, না তোমার পূর্ব্বেও কেহ বাস করিয়াছে?"

ইব্রাহিম বলিলেন, "আমার পূর্ব্বে আমার পিতা এবং তৎপূর্ব্বে আমার পিতামহ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই প্রাসাদে বাস করিয়াছেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, "এখানে যখন কেহ স্থায়ী নহে, একের পর অন্য আসিয়া স্থান অধিকার করিতেছে, তখন পান্থশালা বই ইহাকে আর কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে?" ইহা বলিয়াই তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ইব্রাহিম আদ্‌হাম তাঁহার পশ্চাদানুবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু আপনি কে?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি খেজর।" ইহার পর হইতেই ইব্রাহিম আদ্‌হামের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি রাজবৈভব পরিত্যাগ করিয়া খোদা-প্রাপ্তির জন্য বনবাসী হন এবং পরে কঠোর উপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন।

নবম পরিচ্ছেদ

——):#:(——

রাবেয়া দারিদ্রতাকেই নিজের ভূষণ করিয়া লইয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, "দারিদ্র্যই আমার গৌরব।" তদনুযায়ী প্রকৃত ইস্‌লামসেবকগণ যে দরিদ্রতার ভিতর দিয়াই সিদ্ধিলাভ করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ ইস্‌লামের সাধকমণ্ডলী জীবনেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের অধিকাংশই দারিদ্র্য ও নির্য্যাতনের ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য ও বরেণ্য হইয়াছিলেন।

অনেক সময়ে রাবেয়াকে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা যাইত। একদিন তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া বস্‌রার জনৈক অভিজাতের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "মা আপনি যদি একবার মাত্র বলেন তবে এই স্থানে এমন অনেকেই উপস্থিত আছেন, যাঁহারা আপনার সকল অভাব পূর্ণ করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিতে পারেন।" হজরত রাবেয়া বলিলেন, "না বৎস

আমার পারিবারিক অভাবের কথা আমি অন্যের নিকট বলিতে লজ্জা বোধ করি। সমস্ত বিশ্বসংসারই খোদার, আমার যদি ভিক্ষার প্রয়োজন হয়, আমি তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করিয়া আমার অভাব পুরণ করিয়া লইব।” এই চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যেই সাধনার সকল সুখ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাবেয়া একটি পুরাতন মাদুরে ইষ্টক উপাধান করিয়া শয়ন করিতেন এবং একটি ভগ্ন জলপাত্র মাত্র তাঁহার সম্বল ছিল। হজরত মালেক তাঁহার সমসাময়িক একজন তাপস ছিলেন, একদিন তিনি ইহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে বলিলেন, “বিবি রাবেয়া, অনেক ধনবানের সহিত আমার পরিচয় আছে। আপনি যদি বলেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতে আপনার জন্য কিছু চাহিয়া আনিতে পারি।” রাবেয়া বলিলেন, “আপনি বড় ভুল করিলেন। ধনবানকে যিনি প্রাচুর্য্য দান করেন, ক্ষুধিত ও নিরন্নকে যিনি অন্ন দান করেন, তিনিই আমার অভাব পূর্ণ করিবেন। অপরের সে সাধ্য নাই। তাঁহার দয়া ধনী-নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের উপরেই সমভাবে বর্ষিত হয়।” তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা এই রূপ পবিত্র ভাবের বিকাশ হইত বলিয়াই আজি এই সুদূর

কালেও সকল বন্ধন বিস্মৃত হইয়া জগতের নরনারী-সমূহ এই তপস্বিনী মহিলার কথা অসীম ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া ধন্য হয়!

মানুষ নিজের হৃদয় দিয়াই খোদার স্বরূপ অনুভব করিয়া থাকে, তাই মানুষ সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। রাবেয়া নিজের ভিতরে খোদার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তিনি সকলের নিকট হইতে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন।

রাবেয়া জীবন-সন্ধ্যায় সর্ব্বদা আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতেন। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "আমার হৃদয়ের মধ্যে যে পীড়া আছে, পৃথিবীর কোন চিকিৎসকই তাহার ঔষধ অবগত নহে। কেবল খোদার দর্শন লাভেই সে পীড়ার নিবৃত্তি হইতে পারে।" এই পীড়া অনন্তের সহিত শান্তের, পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলনের ব্যাকুলতা বই আর কিছুই নহে।

একবার রাবেয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে তাঁহার পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রাতঃকালে আমার মন স্বর্গের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, সেই কারণে আমার সখা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এই পীড়া সেই

ভৎর্সনার ফল।" কি গভীর উপদেশপূর্ণ বাণী! নিষ্কাম সাধনার কি উজ্জ্বল নিদর্শন! তাঁহার মনে যে একটু কামনার লেশ ছিল, তিনি এইরূপে তাহা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন।

স্বর্গলাভের বাসনা, সে ত কামনারই কথা। প্রকৃত সাধক যিনি তিনি ত ইহা আকাঙ্ক্ষা করেন না যে, তাঁহার স্বর্গলাভ হউক। তিনি চাহেন আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে, তিনি চাহেন নিজের সত্তাকে খোদার সত্তাতে ডুবাইয়া দিতে—নিজকে খোদাময় করিতে। ইহা যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে তিনি সেই স্বর্গই প্রার্থনা করেন, বাসনা-কামনার স্বর্গ তিনি চাহেন না। যিনি ইহা পারেন তিনি যে কেবল নিজেই ধন্য হন, এমন নহে, তিনি মানবজাতিকে ধন্য করেন, বিশ্বজগতকে পুণ্য পবিত্রতার জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও গরীয়ান করেন।

রাবেয়া পীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া হজরত আবদুল ওয়াহেদ, আমর ও সুফিয়ান একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। এই সর্ব্বত্যাগিনী নারীকে তাঁহারা আন্তরিক এত ভয় ও ভক্তি করিতেন যে তাঁহার নিকটে সহসা কোন কথা বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন। রাবেয়া তখন তাপসপ্রবর সুফিয়ানকে বলিলেন, "আপনার কি

কিছু বলিবার আছে ?” তিনি বলিলেন, “আপনি খোদার নিকট প্রার্থনা করুন, তাহা হইলেই তিনি আপনাকে রোগমুক্ত করিবেন।” হজরত রাবেয়া সুফিয়ানের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনার কি ইহা জানা নাই যে কাহার আদেশে এই পীড়া হইয়াছে ? খোদার ইচ্ছার অনুযায়ীই কি আমি পীড়িত হই নাই ?” সুফিয়ান নিবেদন করিলেন, “আবেদা, আপনার উক্তিই সত্য।” তখন তিনি বলিলেন, “আপনি জানেন যে খোদাতা’লাই আমাকে এই পীড়া দিয়াছেন, তবে আপনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে কেমন করিয়া প্রার্থনা করিতে বলিতে-ছেন ? সখার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কখনও কিছু করি নাই, আর আজ কি তাহা করিব ?”

ইহার পর হজরত সুফিয়ান বিবি রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় কি ?” তিনি বলিলেন, “আপনি জ্ঞানবান, আপনি কেমন করিয়া আমাকে এইরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? একদিন নয়, দুইদিন নয়, আজ দশ বৎসর ধরিয়া আমার মনে সরস খোর্ম্মা-ফল খাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে। আপনি জানেন, বসরায় খোর্ম্মার অভাব নাই, তবুও

আমি নিজের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেই নাই। আমি খোদার দাসী, দাসীর আবার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? প্রভুর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি না।” ধন্য সেই জীবন যে জীবনের অধিকারিণী খোদা ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন নাই, আর কাহাকেও চিনেন নাই! যাঁহার নিজের কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছিল না, খোদাতালার হাতেই সকল সমর্পণ করিয়া একদিক দিয়া রিক্ত হস্ত হইয়াও আর এক দিক দিয়া অতুল পারমার্থিক ধনের অধিকারিণী হইয়া ছিলেন।

হজরত সুফিয়ান বলিয়াছেন যে, তিনি এক রজনী বিবি রাবেয়ার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। রাবেয়া সন্ধ্যা সমাগমে নামাজ পড়িতে বসিয়াছিলেন, আর যখন উষার প্রথম আলোকরেখা দেখা দিয়াছিল, তখন আসন হইতে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সখা যে তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি উপাসনা করিবার শক্তি ও একাগ্রতা দান করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি আকুল প্রাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করেন,—“খোদা তুমি যদি আমাকে দোজখে দেও, তাহা হইলে আমি তোমার এমন সকল গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া দিব যে দোজখ আমার নিকট হইতে সহস্র

বৎসর দূরে পলায়ন করিবে। এলাহি! তুমি আমার জন্য পৃথিবীতে যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা তোমার শত্রুকে বিতরণ কর, আর পরলোকের জন্য আমার অংশে তুমি যাহা বণ্টন করিয়া দিয়াছ, তাহা তোমার বন্ধুকে দেও। একা তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তোমা ছাড়া আর কিছুই চাহিনা। আল্লা, আমি যদি কখনও নরকের ভয়ে তোমার উপাসনা করিয়া থাকি, তবে তুমি আমাকে নরকের আগুনেই জ্বালাইয়া দেও। আর যদি বেহেশ্‌তের আশায় আমি তোমার ভজনা করিয়া থাকি, তবে তুমি বেহেশ্‌ত আমার জন্য হারাম কর। যদি তোমারই জন্য কেবল আমি তোমার উপাসনা করিয়া থাকি, তবে প্রভো, তোমার বিশ্ব-বিমোহন রূপ দর্শন হইতে আমায় বঞ্চিত করিও না। তোমার অনন্ত জ্যোতিঃ-সমুদ্রে আমায় ডুবিতে দেও, নাথ!"

দশম পরিচ্ছেদ

——):*:(——

একদা জনৈক সুফীকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" তদুত্তরে তিনি বলেন, "আকাশ আমারই আদেশে চালিত হইতেছে; নক্ষত্রপুঞ্জ আমারই আদেশ মানিয়া চলিতেছে, পৃথিবী আমারই আদেশে শস্য দান করিতেছে, মেঘমালা আমারই আদেশে বর্ষণ করিতেছে, বায়ু আমারই আজ্ঞাবহরূপে প্রবাহিত হইতেছে, ফুল আমারই আদেশে ফুটিতেছে, আমারই অনুজ্ঞায় ফুলের কোরক ভেদ করিয়া ফলের উৎপত্তি হইতেছে, আমিই সকল করিতেছি।" প্রশ্নকর্ত্তা ইহা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপনি এ কি কথা বলিতেছেন?" সুফী বলিলেন, "আমার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা কামনা নাই, আমি আমার সকলই খোদাতা'লাতে অর্পণ করিয়াছি। এই সকল কার্য্য তাঁহারই ইচ্ছায় সাধিত হয়, তিনিই ইহা নিজের বাসনার অনুরূপ বিতরণ করেন। তাই, খোদা যাহা করেন তাহাই আমি আমার করা কাজ বলিয়া মনে করিয়া থাকি।"

এইরূপ কথা শ্রবণ করিলে প্রথমে শ্রোতার মনে এই ভাবের উদয় হওয়া বিচিত্র নহে যে বক্তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। কিন্তু একটু ভিতরে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এইরূপ কথা কেবল তাঁহারাই বলিবার অধিকারী যাঁহারা অবিরত সাধনা দ্বারা খোদাতা'লাকে প্রীত করিয়া তাঁহার অনন্ত জ্যোতির দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন,—খোদার প্রেমে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন, অহংজ্ঞান হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করিয়াছেন। তপস্যার শেষ স্তরে না পঁহুছিলে এইরূপ ভাব কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না।

তাপসী রাবেয়া যখন এই স্তরে উপনীত হইয়া সিদ্ধি লাভে ধন্যা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারও ঠিক এমনই অবস্থা হইয়াছিল। অহংজ্ঞানকে খোদা-প্রেমে ডুবাইয়া দিয়া—সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিয়া—জগতের অতি অল্প সংখ্যক নরনারীই বিশ্বস্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়েন। রাবেয়া এই অল্প সংখ্যকদের মধ্যেই যে একজন ছিলেন, তাঁহার অত্যুজ্জ্বল ধর্ম্মজীবনের প্রতি ঘটনার ভিতর দিয়াই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

হজরত হাসান বস্‌রী, হজরত শাকিক্ বল্‌খী এবং হজরত মালেক দীনার একদিন রাবেয়ার সহিত নানাবিধ

পরমার্থ-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছিলেন। তখন হজরত হাসান বস্‌রী বলিলেন, "যে কষ্টের মধ্যে ধৈর্য্য ধারণ না করিতে পারে, তাহার খোদা-প্রেমের দাবী ঠিক নয়!" হজরত শাফিক্ বলিলেন, "সে প্রেমের পথের অনধিকারী।" হজরত মালেক বলিলেন, "যে বন্ধুর দেওয়া কষ্টের মধ্যে মধুরতার স্বাদ পায় নাই, তাহার ভালবাসা খাঁটি নয়।" রাবেয়া বলিলেন, "যে মহবুবের (বন্ধুর) দর্শনকালে ব্যথার কথা না ভুলিয়া যায়, সে প্রেমের দাবী করিতে পারে না।"

রাবেয়ার সকল কথার মধ্য দিয়া শুধু একটি কথাই বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাহা নিষ্কাম প্রেম। খোদা-তা'লাকে যে প্রকৃত ভালবাসিবে, সে তাঁহার দেওয়া সকল সুখ-দুঃখ, মান-অপমান হৃষ্টচিত্তে তাঁহারই প্রেমের দান বলিয়া বরণ করিয়া লইবে। যাঁহারা ইহা করিতে না পারেন, তাঁহাদের সাধনার কোন মূল্য নাই, উহা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমরা সাধারণ মানবজীবনে নরনারীর প্রেমের মধ্যে যাহা দেখিতে পাই, পারমার্থিক জীবনে তাহারই পূর্ণতম, উচ্চতম অভিনয় হয়। একাগ্রতাই প্রেমের প্রাণ। সাধারণ নরনারীর মধ্যে প্রেম তখনই সার্থক হয়, যখন তাহা একাগ্র হয়।

ভালবাসার অত্যাচার বলিয়া একটা কথা প্রেমের জগতে প্রচলিত আছে। এই অত্যাচার যে সহ্য করিতে পারে নাই, তাহার প্রেম লাভ হয় নাই। আমি যাহাকে ভালবাসিব, যাহার ভালবাসার আকাঙ্ক্ষী হইব, তাহার দেওয়া প্রেম লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যাচারও আমাকে হাসি মুখে সহ্য করিতে হইবে। এই অত্যাচার কেবল তাঁহারাই সহ্য করিতে পারেন, যাঁহারা জানেন যে ইহা যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, ইহা দ্বারা কেবল প্রেমের গভীরতারই পরীক্ষা হয়।

সাধারণ মানবজীবনের এই দৃশ্য পারমার্থিক জীবনেও অভিনীত হয়। সেখানেও ভালবাসার অত্যাচার আছে। সে অত্যাচার যাঁহারা অম্লানবদনে সহ্য করিয়া অনন্যহৃদয়ে বন্ধুর চিন্তায় ও প্রেমে নিমগ্ন থাকিতে পারেন, তাঁহাদেরই কেবল বন্ধুর দর্শন লাভ ঘটে, তাঁহারাই বন্ধুর প্রেমের অধিকারী হইয়া, তাহার মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত করিয়া বন্ধুময় হইয়া যাইতে পারেন।

একাগ্রতাই সাধনার জীবন। সাধনা একবিধ নয়, বহুবিধ। কেহ পরমার্থের সাধক, কেহ জ্ঞানরাজ্যের নানা বিভাগের সাধক। যিনি যে বিষয়েরই সাধনা করুন, একাগ্রতা না থাকিলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইবে না।

বৈজ্ঞানিক যখন প্রকৃতির নানা রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়েন তখন একাগ্রতাই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হয়। তিনি একাগ্রচিত্তে এক একটি বিষয়ের ধ্যান করিয়া যখন সত্যের উদ্ধারে সক্ষম হয়েন, তখন তাঁহার জীবন আনন্দময় হয়। সেইরূপ, যাঁহারা পরমার্থের সাধক, তাঁহাদিগকেও একাগ্র হইতে হয়,—অনন্য-প্রাণ হইয়া খোদার চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হয়। যখন তাঁহারা বাহিরের সকল বিস্মৃত হইয়া একাগ্র মনে কেবল খোদাতা'লার ধ্যান-ধারণায় তন্ময় থাকেন, তাঁহার সকল অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করেন, হৃদয়ের অতি নিভৃত-নিলয়েও কষ্টের লেশমাত্র অনুভব করেন না, রহিম ও রহমান তখনি আসিয়া তাঁহাদের শিরে তাঁহার ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ জ্যোতির ধারা বর্ষণ করেন!

রাবেয়া বলিতেন, "চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা সর্ব্বদা মন জাগ্রত রাখিবে। মন সজাগ থাকিলে বন্ধুর আহ্বানের কিছু বাকী থাকে না। যিনি নিজের মন খোদার ভালবাসায় বিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই মন সজাগ হইয়াছে,—তিনিই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।" মনের সজাগ অবস্থায় উপনীত হইতে সাধনার দরকার। এই সাধনার ভিত্তি একাগ্রতা। একাগ্রতাবিহীন সাধনার কোন মূল্য নাই।

অনেকের বিশ্বাস, সিদ্ধজীবনের পরিচয় অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাবেয়া বলিতেন, "পানিতে চলা, হাওয়ায় উড়া, সম্মান ও খোদার সান্নিধ্য লাভের নিদর্শন নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সমূহও পানিতে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়, অতি ক্ষুদ্রতম মক্ষিকাও বায়ুতে অবলীলাক্রমে উড্ডীন হয়, ইহা অতি সামান্য বিষয়। এই সকল কার্য্য সিদ্ধিলাভের পরিচয় প্রদান করে না। ইহা বাহিরের জিনিষ, ইহার সহিত সাধন-জীবনের কোন সম্পর্কই নাই।"

জনৈক খোদান্বেষী বিবি রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এবাদতের (উপাসনার) অবস্থা কিরূপ ?" তিনি বলিলেন, "উহা ভালবাসার সহিত দুই রাকাত নামাজ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজের উষ্ণ চঞ্চল রক্তধারা দ্বারা মন বিধৌত না করিতে পারিবে, ততক্ষণ তোমার ওজু ঠিক হইবে না। ওজু ঠিক না হইলে নামাজও ঠিক হইবে না।" নিজের মনের গোপন-পুরে যে পাপ, অহঙ্কার, অভিমান ও হিংসা প্রভৃতি বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহা ধৌত করিয়া মন পরিষ্কার করিতে না পারিলে যে খোদাকে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, ইহা চির-সত্য। হৃদয়ের ক্লেদ ধৌত করিতেই সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে

হইবে। উহা না করিতে পারিলে খোদাপ্রাপ্তি হয় না। সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইলেই এই সমুদয় সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া সকলের আগে হৃদয় নির্ম্মল করিতে হয়। নির্ম্মল হৃদয়েই কেবল খোদাতালার অনন্ত জ্যোতির বিকাশ হয়, অন্যত্র হয় না, হইতে পারে না।

হজরত সালেহ্ বলিতেন, "যে কেহ অপর কাহারও বদ্ধদ্বারে বারবার আঘাত করিবে গৌণে হউক অগৌণে হউক সে দ্বার একবার নিশ্চয়ই মুক্ত হইবে।" যাঁহারা খোদার দ্বারে পঁহুছিয়া বদ্ধদ্বার দেখিয়া নিরাশ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাঁহাদের সিদ্ধি লাভ হয় না। সে দ্বারে বারবার আঘাত করিয়া হৃদয়ের একাগ্রতা জ্ঞাপন করিতে হয় এবং দ্বার উন্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আঘাতের পর আঘাত করিয়া নিবেদন করিতে হয়, "ওগো দ্বার খুলিয়া দাও। আমি তোমাকেই চাই, তোমাকেই পাইতে আসি-য়াছি, তোমাকে আমার পাইতেই হইবে। নিষ্ঠুরের মত আমাকে তোমার দ্বার প্রান্ত হইতে ফিরাইয়া দিও না। যতদিন দ্বার না খুলিবে আমি তোমার দ্বারের ধুলাতেই আপনাকে লুণ্ঠিত করিব। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি, তোমার ভালবাসা পাইতে আসিয়াছি। যত প্রকারে সম্ভব হয় তুমি আমার ভালবাসা পরখ করিয়া দেখ, তাহা খাঁটি,

মেকি নহে।” খোদা যখন দেখেন তাঁহার ভালবাসার প্রার্থী তাহার সকল প্রাণমন দিয়া কেবল তাঁহাকেই ভাল-বাসিয়াছে, সে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের আর সকলকেই ভুলিয়াছে, কেবল তাঁহাকেই স্মৃতিতে জাগরূক রাখিয়াছে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না, ভক্তের ভক্তির নিকট তিনি নিজেকে ধরা দেন—নিজের ভালবাসার জ্যোতিঃ দিয়া ভক্তকে স্নাত করিয়া দেন। ইহাই সাধনার চরম অবস্থা। তখন সাধক আনন্দময় হয়েন। এই আনন্দ লাভেরই আর এক নাম সিদ্ধি-লাভ। অনবদ্য প্রেম ব্যতীত যে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না রাবেয়া বস্‌রীও এ কথাই বলিয়াছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

——):০:(——

আত্মা অবিনশ্বর, কিন্তু মানুষ নশ্বর। জন্ম ও মৃত্যু মানবজীবনের প্রথম ও শেষ অভিনয়। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সজ্জন ও দুর্জ্জন সকলকেই জীবনের পথ বাহিয়া এই অভিনয় করিয়া যাইতে হইবে। মানব জাতির ইতিহাসে এই অভিনয় হইতে মুক্তি পাইয়াছে এমন কাহারও কথা বর্ণিত হয় নাই। হজরত রাবেয়াও যে এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

মৃত্যুর কাল ঘোর ছায়া যখন এই তপশীলা, সিদ্ধকামা মহীয়সী নারীকে বেষ্টন করিল, মৃত্যুর দূত আসিয়া যখন তাঁহার দ্বারের প্রান্তে দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার পার্শ্বে বস্‌রার সাধুমণ্ডলী ও সজ্জনবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তিনি সাধন-প্রসঙ্গে কত কথা বলিলেন, নিজের জীবনে তিনি খোদাতা'লার দেওয়া কত করুণালাভ করিয়াছেন, তাহা প্রাণস্পর্শী-ভাষায় বর্ণন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তাঁহার নিজের কোন বংশ-মর্য্যাদা ছিল না, তিনি একটা কুৎসিত নারী-মাত্র ছিলেন,

কিন্তু খোদা তাঁহাকে কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার সকল গ্লানি ঢাকিয়া দিয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে যে শক্তি জাগাইয়া দিলেন, যে সচকিত, সতর্কভাব আনয়ন করিলেন, যে অনুভূতি উদ্দীপিত করিলেন, তাহারই ফলে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে। তিনি খোদাকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে পাইয়াছেন, তাই আজ তাঁহার সফল জীবন, তৃপ্তিতে তাঁহার দেহ-মন পূর্ণ! আনন্দময়ের খোঁজে তিনি বাহির হইয়াছিলেন অনাথিনীর বেশে, ধরি ধরি করিয়া তিনি তাঁহাকে ধরিতে পারিতে ছিলেন না, কিন্তু শেষে তিনি দেখিতে পাইলেন আনন্দময় দূরে নাই, তিনি সগৌরবে তাঁহার হৃদয়ের মাঝে বসিয়া আছেন! আনন্দময়কে খুঁজিয়া বাহির করাই সাধকের কাজ, তাঁহাকে পাইলেই সাধনার অবসান হয়, সিদ্ধ আসিয়া আপনি ধরা দেয়।"

এইরূপে তিনি যাঁহাদের ভক্তি করিতেন, ভালবাসিতেন, স্নেহ-পাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের সহিতই হাসিমুখে মন খুলিয়া নানা কথা বলিলেন। তখন কেহ বুঝিতেও পারেন নাই যে তাঁহার আজিকার এই উচ্ছ্বাসময়ী বাণীই তাঁহার মর-জীবনের শেষ-বাণী। জীবন যে তাঁহার শেষ হইয়া আসিতেছে,

খোদা যে তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লইতেছেন, তাহার অনুভূতিতেই যে তিনি আজ মুক্ত-বাক হইয়াছেন একথা কেহ ধারণাও করিতে পারেন নাই। সকলেই মনে করিতেছিলেন, তাঁহার রোগের আজ কিছু উপসম হইয়াছে, তিনি আজ আরোগ্যের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, তাই আনন্দে তাঁহার মনের দ্বার আজ এত মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে দীপনির্ব্বাণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের ক্ষণিক উজ্জ্বলতা, ইহা যে তাঁহার চির-জীবনের আরাধনার বস্তুর সহিত, তাঁহার বন্ধুর সহিত, স্বামীর সহিত মিলিত হইবার আশু সম্ভাবনাজনিত আনন্দ ও ব্যাকুলতা, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

সমাগত জনমণ্ডলী যখন তাঁহার রোগ-মুক্তির মধুর আশায় উৎফুল্ল, চারিদিক যখন গুঞ্জন-মুখর, তখন তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনারা একটু বাহিরে গিয়া খোদার প্রেরিতদের নিকটে আসিবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিন।' সকলে তাঁহার কথা মত বাহিরে গেলেন। কেহই তখন মনে করিতে পারেন নাই যে মৃত্যু-দূতের সান্নিধ্য তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেনএবং তজ্জন্যই নিজের বাসনা অনুযায়ী বন্ধুর সহিত মিলিত হইবার অবসর খুঁজিয়া লইলেন।

এই ঘটনার অল্প কিছুক্ষণ পরেই গৃহের ভিতর হইতে তিনি বলিয়া উঠিলেন 'হে আত্মা! তুমি খোদার দিকে নিজেকে সঁপিয়া দেও।" তাহার পর সব নীরব! বাহিরেও সকলে নীরবেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের কোলাহলে সে স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলের সম্মতিক্রমে যখন দ্বার মুক্ত হইল, তখন তাঁহারা গৃহাভ্যন্তরে গিয়া কি দেখিতে পাইলেন? তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণহীন দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে, কিন্তু কি রূপের জ্যোতিঃ সে মুখে ছড়াইয়া আছে, কি শান্ত মাধুরীতে সে মুখ ভরিয়া গিয়াছে,—শিশুর সরল হাসির মত কি মোহন হাসি সে মুখে ফুটিয়া রহিয়াছে! সে দৃশ্য দেখিয়া সকলে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, কাহারও মুখে একটি কথাও ফুটিল না! কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকেরই নীরবতা! সে নীরবতা ভঙ্গ হইল তখন, যখন তাঁহারা সকলেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ইহা নিদ্রা নয়, ইহা মহা-প্রস্থান, ইহা ইহ-জীবন হইতে অবিনশ্বর অনন্ত-জীবনে প্রয়াণ, তখন সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। হায়! আর তো তাঁহারা রাবেয়ার মধুর উপদেশ শুনিতে পাইবেন না, আর তো তাঁহারা তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইবেন

না,—তাঁহার তিরস্কাকে পুরস্কার মনে করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না!

রাবেয়ার মৃত্যু সংবাদ যখন মুহূর্ত্তে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন প্লাবনমুক্ত জল-প্রবাহের মত সমগ্র বস্‌রা নগরীর জন-প্রবাহ তাঁহার সাধন-কুটীরের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া পড়িল! সকলের মুখেই বিষাদ মাখা, সকলেই বলিতেছেন, হায়! এ কি হইল? কেন এমন হইল? কিন্তু এইরূপই হইতে হয়! মানুষ মাত্রকেই এই শেষ অভিনয় করিয়া পৃথিবীর নিকট হইতে চির বিদায় লইতে হয়! ইহার আর উপায়ান্তর নাই ইহা অনিবার্য্য!

শোকের আবেগ যখন প্রশমিত হইল, তখন সকলে মিলিয়া মহা-সমারোহের সহিত তাঁহাকে জবল তীরে সমাধিস্থ করিয়া আসিলেন। এখনও তাঁহার সমাধি তথায় বিদ্যমান আছে, কালের আঘাতে তাহা মুছিয়া যায় নাই। এখনও তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চির-জাগরূক রাখিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বহু লোক তথায় গিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

ঐতিহাসিকদের মতে ১২৩ হিজরীতে তাপসী রাবেয়া লোকান্তর গমন করেন!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

——):০:(——

সুফি মত ইস্‌লামের অভ্যন্তরে এক অতি বিরাট শক্তি স্বরূপ কার্য্য করিতেছে। সুন্নি ও শিয়া এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই মতবাদ প্রসার লাভ করিয়াছে। ভারতীয় মোস্‌লেমদের ধর্ম্মজীবনেও ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম নহে। বঙ্গদেশে যাঁহারা পীর সাহেবরূপে পরিচিত, তাঁহারা প্রকারান্তরে একটু পরিবর্ত্তিত আকারে এই সুফি মতই প্রচার করিয়া থাকেন। জগতে এই সুফি মত প্রথম প্রচার করেন, তাপস হাসান বস্‌রী। রাবেয়াও সুফি মতাবলম্বিনী ছিলেন। অতএব তাঁহার পবিত্র জীবন-কথার আলোচনা প্রসঙ্গে সুফি মত সম্বন্ধে কিছু বলা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কেহ কেহ বলেন, আরবী 'সুফ' শব্দ হইতে সুফি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'সুফি' শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্র। আর এক দল বলেন, "সুফ" এক প্রকার মোটা পশ্‌মি কাপড়। খোদান্বেষী একদল মুসলমান সাধক এই বস্ত্র পরিধান করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগকে

সুফি বলা হইত। এই সাধকবৃন্দ আড়ম্বরহীন ছিলেন। তৃতীয় আর এক পক্ষ বলেন যে, গ্রীক 'সোফস্' অর্থাৎ জ্ঞানী শব্দ হইতেই সুফি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। যে শব্দ হইতেই সুফি নাম গৃহীত হইয়া থাকুক না কেন, সুফি সম্প্রদায়ের শক্তি ও প্রতিপত্তি আজ মানবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

তাপসী রাবেয়া বলিতেন, 'খোদাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে।' খোদার জন্যই খোদাকে ভালবাসিতে হইবে, ইহাই ছিল রাবেয়া বস্‌রীর জীবনের মূলকথা। তিনি তাঁহার নিজের জীবনের মধ্য দিয়া এই কামনা-শূন্য ভালবাসার সাধনাই করিয়া গিয়াছেন। যে পার্থিব ভালবাসা মানুষের পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তির মূলীভূত কারণ, তিনি সেই ভালবাসাকেই রূপান্তরিত অবস্থায় একমাত্র নিখিলের স্বামীতে অর্পণ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। তাই যে জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল অখ্যাত ভাবে, তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল বিশ্ব-খ্যাতিতে।

সাধুতা, সদাচার এবং খোদার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতাই রাবেয়ার আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সম্বল ছিল। এই সকল ধনে ধনী হইয়া যাঁহারা সাধন-পথে অগ্রসর হন, খোদাতা'লা নিজে প্রেমময় রূপে তাঁহাদের পথের সকল বাধা বিদূরীত করিয়া তাঁহাদিগকে সিদ্ধির রাজ্যে পঁহুছাইয়া দেন! তখন তাঁহাদের আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, তাঁহারা খোদাতে লীন হইয়া যান। এই শেষ স্তরে পঁহুছিলেই সাধকগণ আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠেন, আনাল্‌হক—আমি খোদা! বাহ্যধর্ম্মের নিয়মানুসারে এই উক্তি দোষাবহ সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মের যে আর একটা প্রচ্ছন্ন দিক আছে, সেই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে দোষের কিছুই নাই।

খোদাতা'লার সাধনা করিতে করিতে যোগস্থ পুরুষ যখন দেখিতে পান যে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতে একমাত্র খোদাই বিরাজ করিতেছেন,—মানুষে তিনি, কীটে তিনি, পতঙ্গে তিনি, বৃক্ষে তিনি, ফুলে তিনি, ফলে তিনি, পর্ব্বতে তিনি, সরিতে ও সাগরে তিনি. মরুভূমির প্রতি বালুকণায় তিনি, আকাশের বায়ুস্তরে তিনি, চন্দ্রে তিনি, সূর্য্যে তিনি, তারার মালায় তিনি, গ্রহ-উপগ্রহে তিনি—সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করি-

তেছেন, তখন সিদ্ধ তাপস বিস্মৃত হন তাঁহার অকিঞ্চিৎ-কর মানব জীবনের কথা, তাঁহার ক্ষুদ্র অস্তিত্বের কথা। তখন তিনি খোদার দেওয়া অধিকারে মত্ত হইয়া, সান্ত হইতে অনন্তে পঁহুছিয়া বলিয়া উঠেন, আনাল্-হক। একদিন তাই সুফি মনসুর হাল্লাজ শত অত্যাচারে জর্জ্জরিত-প্রাণ হইয়াও আনাল্-হক বলিতে বলিতে আনন্দে জীবন দান করিতে পারিয়াছিলেন!

সুফি মত বা অদ্বৈতবাদ উন্নততর উপায়ে অসীমের সন্ধান মাত্র। মানব জাতির ধর্ম্মেতিহাসে মুসলমানগণই ইহার সর্ব্বপ্রথম প্রচারকারী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

সুফি মত সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলেন, কোরানের মহাবাণীর ভিতরে একটা গভীর ও নিগূঢ়তম অর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণ ভাষ্যকারগণ উহার যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহাই উহার চরম ও পরম অর্থ নয়। শরিয়তকে অবহেলা করিবার জন্য সুফি মতের উদ্ভব হয় নাই। উহা সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলিয়া গভীর ও নিগূঢ়তম ভাবের উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়াই সুফী মত জন্মলাভ করিয়াছে। এই দৃঢ় প্রত্যয়,—কোরানের শিক্ষা এবং হজরত রসুল করিমের

উপদেশের সহিত পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিশ্বময় খোদাতা'লার ব্যাপ্তি বিষয়ে সুগভীর বিশ্বাস—এই আদর্শবাদকে উপলক্ষ করিয়া যে উন্নত দর্শন ক্রমশঃ মুসলমানগণের মধ্যে বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহাই সুফি মতরূপে বিশ্বে পরিচিত হইয়াছে।

প্রাচ্যে ইমাম গাজ্জালী এবং প্রতীচ্যে ইব্‌নে তোফেলই সুফি মতের আদর্শ প্রতিনিধি রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা বিচারবুদ্ধি-সম্ভূত দর্শন-শাস্ত্রের উপরে বিতশ্রদ্ধ হইয়াই ইমাম গাজ্জালী সুফি মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিমিয়ায়ে সা'দত তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। আল্ গাজ্জালীর প্রভাবেই প্রাচ্য দেশীয় মুসলমানদের মধ্যে সুফি মত বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল এবং প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মুসলমান মনীষিগণ কেবল সেই কারণেই এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মওলানা জালালুদ্দিন রুমি, যাঁহার মস্‌নবী সুফিগণ অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, সানায়ী, জালালুদ্দিন রুমি যাঁহাকে নিজের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, ফরিদুদ্দিন আত্তার, শাম্সুদ্দিন হাফেজ, খাকানী, সাদী এবং নিজামী ইঁহারা সকলেই সুফি মতাবলম্বী ছিলেন।

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া এই মনোরম মতবাদের নির্ম্মল ও উন্নত আদর্শই ইস্‌লামের কবি-সম্প্রদায়কে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ রচনার উপাদান যোগাইয়াছিল। প্রকৃতির বুকের উপরে স্রষ্টার বিশ্বজনীন প্রেমের যে সকল ছোট বড় অভিজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে, রুমী, সানায়ী এবং আত্তার তাহা সুমধুর গীতি কবিতায় এমন উজ্জ্বল করিয়া প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন যে. কোরান শরিফের পরেই তাহা সুফিদের নিকট সম্মান পাইয়া থাকে।

সুফি কবিগণ খোদাকে প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিয়াছেন ও গাইয়াছেন। নির্ঝরের অবিরাম প্রবাহিত ধারার মত তাঁহাদের হৃদয়ের উৎস হইতে যে সঙ্গীত-সুধা অবিশ্রাম-গতিতে ঝরিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। তাঁহাদের পরবর্ত্তীকালের ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতই তাঁহারা প্রকৃতির যবনিকার অন্তরালে নহে, কিন্তু প্রকৃতির বুকের উপরে খোদাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। বিশ্বময় এই বিপুল, বিশাল অনুভূতিই সুফি মতের প্রাণ। এক কথায় সৃষ্টির প্রতি নয়নপাত করিয়াই তাঁহারা স্রষ্টার প্রেমে মজিয়াছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

কৃচ্ছ্র সাধনের ভিতর দিয়াই সুফিগণ অসীমের সন্ধানে তৎপর হন। সুফি মতবাদ কখনও ইস্‌লামী শরিয়তকে উপেক্ষা করে নাই, পূর্ণরূপে উহার অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। আমরা একজন সুপ্রসিদ্ধ সুফীর জীবন-কথার আলোচনা করিয়া এই বিষয়টি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

শেখল্‌-ইস্‌লাম আবু সয়ীদ ইব্‌নে আবিল খায়ের সুফি-জগতের একজন প্রধান পুরুষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তিনি তাঁহার প্রাথমিক সুফি-জীবন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমি যখন সুফি মত প্রথম গ্রহণ করি, তখন আমি অষ্টাদশটি বিষয় বিশেষ ভাবে মানিয়া চলিতাম। আমি সর্ব্বদা রোজা রাখিতাম, কখনও কোনও হারাম জিনিষ স্পর্শ করিতাম না। অবিরত আমি কেবল জেকর করিতাম। রাত্রে আমি কখনও নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিতাম না। এমন কি ভূমিতে আমার দেহ কখনও এলাইয়া দিতাম না। আমি যখন ঘুমাইতাম,

বসিয়াই ঘুমাইতাম। আমি সর্ব্বদাই কাবাকে সম্মুখে রাখিয়া উপবেশন করিতাম। আমি কখনও কিছুতে হেলান দিতাম না। কোন সুন্দর যুবা, কি যে সকল নারীকে আমি অবগুণ্ঠনাবস্থায় ভিন্ন দেখিতে পারি না, তাহাদের দিকে কখনও আমি দৃষ্টিপাত করিতাম না। আমি কখনও উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করি নাই। আমি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট চিত্তে খোদার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতাম। আমি সকল সময় মস্‌জিদেই অতিবাহিত করিতাম, কখনও বাজারে যাইতাম না। কারণ রসুল করিম বলিয়াছেন, বাজার সর্ব্বাপেক্ষা আবর্জ্জনা পূর্ণ স্থান এবং মস্‌জিদ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান। আমি সর্ব্ববিধ কর্ম্মে হজরতের অনুসরণ করিতাম। আমি প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার করিয়া কোরান খতম করিতাম।

"সেই সময়ে আমি দৃষ্টি বিষয়ে ছিলাম অন্ধ, শ্রুতি বিষয়ে ছিলাম বধির এবং বাক্য বিষয়ে ছিলাম মূক। পূর্ণ এক বৎসর কাল আমি মৌনী ছিলাম। লোকেরা তখন আমাকে উন্মাদ বলিত, আমি অম্লানচিত্তে সে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলাম। কারণ, হাদিসে আছে, যে পর্য্যন্ত জনসাধারণ কাহাকেও উন্মাদ বলিয়া সন্দেহ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভক্তি পূর্ণ হয় না।

"এই সময়ে হজরত যাহা নিজে করিয়াছেন বা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল কার্য্য ছাড়া আমি আর কিছু করিতাম না। আমি গ্রন্থ পাঠে অবগত হইয়াছিলাম যে হজরত ওহোদের যুদ্ধের সময়ে পায়ে আঘাত পাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমিও ঐরূপ অবস্থায় চারি শত রাকা'ত নামাজ পড়িয়াছিলাম। আমি বাহিরের দিক দিয়া এবং মনের দিক দিয়া সর্ব্বদা হজরতের সুন্নতের অনুসরণ করিতাম। এইরূপে ঐ সকল কাজ আমার প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"ফেরেশ্‌তাগণের উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, নিজেও তাহাই করিতাম। আমি শুনিয়াছিলাম যে, ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে কেহ কেহ মস্তক নিম্নদিকে এবং পদদ্বয় ঊর্দ্ধে দিয়া অতি কঠোর তপস্যা করেন। আমিও নিজের জীবনে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলাম। এইরূপ অবস্থায় আমি প্রার্থনা করিতাম, 'প্রভো, আমি আমার নিজেকে চাহি না। আমার আমিত্ব বিসর্জ্জন দিবার শক্তি আমায় দেও।' ইহার পর আমি কোরান পাঠ করিতাম। পড়িতে পড়িতে যখন, 'আল্লা তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে

প্রচুর শক্তিশালী মনে করেন, কারণ তিনি সকল কথা শ্রবণ করেন ও জ্ঞাত আছেন' এই আয়েতের সমীপবর্ত্তী হইতাম, তখন আমার নয়ন হইতে শোণিতের ধারা বহিত, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম।

"তাহার পরেই অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, আমি তপস্যার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিলাম। এই বিষয়ে আল্লাই আমাকে শক্তি ও সাহায্য প্রদান করিলেন। কিন্তু তখনও আমি মনে করিতাম, এই সকল কাজ আমিই করিয়া থাকি। কিন্তু এই ভাব বেশী দিন রহিল না। যখন আমি আল্লার অনুগ্রহের প্রত্যেক নিদর্শন পাইলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম আমার সকল ধারণাই ভুল, খোদার অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদেই উহা হইয়াছে।

"আমার হৃদয়ে তখন অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল এবং আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম উহার জন্ম হইয়াছিল অহঙ্কার হইতে। যত দিন নিজের জীবনে কেহ এই সকল বিষয়ের আচরণ না করিবে, ততদিন অহঙ্কার কি তাহা বুঝিতে পারিবে না। সম্পূর্ণভাবে শরিয়ত মানিয়া চলিলেই তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইবে। ধর্ম্মকার্য্য হইতে বিরত হওয়া নাস্তিকতা, অহংজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া ধর্ম্মকার্য্য করাও দ্বৈত্যবাদের অনুসরণ মাত্র। যদি 'তুমি'ও

থাক, 'তিনি'ও থাকেন, তাহা হইলে দুইজনের অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। ইহাই দ্বৈত্যবাদ। অতএব খোদাকে পাইতে হইলে আমিত্বকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

"আমার একটি প্রকোষ্ঠ ছিল, আমি সেখানে বসিয়া বসিয়া প্রেমাসক্ত চিত্তে কেবল আমিত্বকে বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতাম। এই সময়ে একটি আলো আসিয়া আমাকে স্নাত করিয়া আমার জীব-দেহের সর্ব্বস্থানের তিমির রাশি বিনাশ করিয়া দিল। সর্ব্ব-শক্তিমান আল্লা আমার নিকটে এই সত্য প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, আমি আর কিছুই নহি, আমি তাঁহারই করুণা এবং দান মাত্র। তখন আমি আনন্দে বলিয়া উঠিলাম—

'চোখ যখন খুল্‌লাম প্রভু নেহারিনু রূপটি তোমার,
মনে ভাব্‌লাম বল্‌বো তোমায়,সকল গোপন কথা আমার।
দেখ্‌লাম চেয়ে দেহ গিয়ে আত্মা আমার জেগে আছে,
তখন আমি তোমায় ছেড়ে বল্‌বো কথা কাহার কাছে!
তোমার সাথে যখন আমি মন্‌টি খুলে কথা বলি,
শেষ হয়না সে কথা মোর, চেয়ে থাকি নয়ন মেলি!'

"ইহার পর সকলে আমাকে নিতান্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। দলে দলে লোক আসিয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সুফি মতাবলম্বী হইল। আমার

প্রতিবেশিগণ সুরাপান পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি সম্মান দেখাইতে লাগিল। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে আমি তাহাদের সম্মানের পাত্র নহি। মস্‌জিদের কোণ হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, 'তোমার প্রভুই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?' তখনি আমার বুকের ভিতরে একটা আলোর বিকাশ হইল এবং আমার হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে যে যবনিকা গুলি ছিল তাহা নিমেষে অপসারিত হইয়া গেল!

"কিন্তু এতদিন যাহারা আমাকে শ্রদ্ধা করিত, তাহারা এখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করিল। এমন কি তাহারা আমাকে নাস্তিকরূপে অভিহিত করিয়া কাজির নিকটে আমার বিরুদ্ধে বিচার-প্রার্থী হইল। আমি যেখানেই যাই, জনসাধারণ বলিতে থাকে যে আমার দুষ্ট প্রকৃতির ফলে তাহাদের ভূমি শস্য দান করিবে না। একদা আমি একটি মস্‌জিদে উপস্থিত ছিলাম। স্ত্রীলোকগণ সেই মস্‌জিদের ছাদে আরোহণ করিয়া আমার উপরে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিল। তখনও আমার কানে বাজিতেছিল সেই একই কথা—'তোমার প্রভুই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?' আমাকে মস্‌জিদে দেখিয়া জমা'তের লোকেরা উপাসনায় বিরত হইল। তাহারা

বলিতে লাগিল, 'এই উন্মাদ যতক্ষণ মস্‌জিদে থাকিবে, ততক্ষণ কখনই আমরা জমা'ত করিয়া নামাজ পড়িব না।' আমি তখন খোদার ভালবাসা যে আমার হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছি তাহারই আনন্দ ও অভিব্যক্তিসূচক গান গাহিতে লাগিলাম।

এই আনন্দের আতিশয্যের পর সঙ্কোচনের আবির্ভাব হইল। আমি কোরান খুলিতেই এই আয়েত আমার চোখে পড়িল, 'তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্য আমি তোমায় সুখও দিব, দুঃখও দিব; এবং তুমি আমাতেই ফিরিয়া আসিবে।' ইহা পড়িতেই আমার মনে হইল, আল্লা যেন আমায় বলিতেছেন, 'তোমার পথে যাহা কিছু আমি রাখিয়া দিতেছি, সে শুধু তোমার পরীক্ষার জন্য। তাহা ভাল হইলেও পরীক্ষা মাত্র, মন্দ হইলেও পরীক্ষা মাত্র। ভাল কি মন্দ করিতে তুমি দেহ নত করিও না, আমার সহিতই তুমি বাস কর।' এইরূপে আর একবার নফ্‌সের (আমিত্বের বা আত্ম-বোধের) পরাজয় হইল এবং তাঁহার করুণাই আমার সকল হইয়া দাঁড়াইল!"

সুফি আবু সয়ীদ এইরূপে সাধনার নানা স্তর অতিক্রম

করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সুফি মতবাদ সম্বন্ধে যে সকল বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা উক্ত মতের সংজ্ঞা স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

তিনি বলিতেন ঃ—

"সুফি মতবাদ দুইটি কথার উপরে প্রতিষ্ঠিত,—এক দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করা এবং একই উপায়ে জীবন যাপন করা।"

"তিনিই সুফি, যিনি খোদা যাহা করেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হন, যেন তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই খোদা সন্তুষ্টি লাভ করেন।"

"খোদার আদেশ ও নিষেধের অধীন হইয়া ধৈর্য্য ধারণ, খোদার নির্দ্দেশিত ঘটনা সমূহে সম্মতি প্রদান এবং আত্ম-সমর্পণ করাই সুফির ধর্ম্ম।"

"সুফি হইতে হইলে কষ্টের পরিসমাপ্তি করিতে হইবে। তোমার নিজের অপেক্ষা তোমার পক্ষে কষ্টের বিষয় আর কিছুই নাই ; কারণ, তুমি যখন নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাক, তুমি খোদা হইতে দূরে অবস্থিতি কর।"

"খোদা ভিন্ন আর সকল হইতে আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখাই সুফি মতবাদ, কারণ খোদা ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।"

উপরের বচনগুলি হইতে আমরা সুফি মতবাদ যে কি, সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। এক মাত্র খোদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সৎভাবে জীবন যাপনই সুফির প্রধান ধর্ম্ম। সুফি হইতে হইলে খোদার প্রতি কার্য্য যে জীবজগতের কল্যাণের জন্যই সাধিত হয়, বিনাবিচারে ইহা মানিয়া লইতে হইবে এবং সুফি তাঁহার সমগ্র জীবন ভরিয়া খোদা যে কাজে সন্তুষ্ট থাকেন তেমন কাজই করিবেন, কখনও তাহার অন্যথা করিবেন না। সুফিকে খোদার আদেশ ও নিষেধ তুল্যভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, খোদার নির্দ্দেশিত পথে চলিতে হইবে,—খোদাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে! সুফির নিকট কষ্ট বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না। আমিত্ববোধই মানুষের সকল কষ্টের মূলীভূত কারণ। ইহা মানুষকে খোদা হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। অতএব সুফীকে এই আমিত্বের বিসর্জ্জন দিতে হইবে—মুক্তির জন্য সকল কলুষতা হইতে আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। এই কাজ কেবল তখন সম্ভব হয়, যখন মানুষের মন সকল জাগতিক প্রলোভন হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া কেবল খোদাকেই নিয়ত স্মরণ করিয়া থাকে,—তাহার মনে খোদা ভিন্ন আর কাহারও কথা স্থান পায় না।

খোদা অবিনশ্বর, আর সকলই নশ্বর, এই অনুভূতিই সুফি-মতবাদের প্রাণ স্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। এই অবিনশ্বরকে চিনিবার ও পাইবার জন্য সুফি চিন্তা ও চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আমিত্ব (ফানা) হইতে দূরে প্রস্থান, আমিত্বের যেকোন অস্তিত্ব নাই, কেবল খোদাই একা বিরাজমান আছেন এই অনুভূতিই তওহিদের প্রাণ। হদিস শরিফে উক্ত হইয়াছে, 'যে নিজেকে চিনিতে পারিয়াছে, সে খোদাকে চিনিতে পারিয়াছে।' ইহার অর্থ এই, যে কেহ নিজেকে নশ্বর (আদম) বলিয়া জানিতে পারিয়াছে, সে খোদাকে অবিনশ্বর (ওজুদ) বলিয়া জানিয়াছে। বুদ্ধি বা বিচার শক্তি দ্বারা এই জ্ঞান অর্জ্জন করা যায় না। এই জ্ঞানলাভ হয় খোদার তজল্লি হইতে। অর্থাৎ নিত্য সনাতন আল্লা যখন মানুষের হৃদয়ে তাঁহার আলোক-কণা বিতরণ করেন, তখনই তাহার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইয়া তথায় আলোকের বিকাশ হয় এবং সেই আলোকের সাহায্যে তাহার এই জ্ঞানলাভ হয়। এই খোদার তজল্লি গ্রহণের স্থান, কল্‌ব, দেল্ বা হৃদয়; ইহা আকার বিশিষ্ট রক্ত-মাংস গঠিত হৃদ্‌পিণ্ড নহে, ইহা একটা আধ্যাত্মিক শক্তি। আল্লা গ্রহণযোগ্য মানব-অন্তরেই এই শক্তি দান করেন।

মানুষ যখন খোদাকে ওয়াহেদ বা এক বলিয়া জানে তখন তাহার খোদার সম্বন্ধে চৈতন্য লাভ হয়। এই আত্মজ্ঞান খোদার লতিফা (অনুগ্রহ) সম্ভূত। কারণ 'তিনি তাঁহার দাসদিগের প্রতি অনুগ্রহশীল (লতিফ)'। আল্লার বদান্যতা ও করুণা হইতেই এই চৈতন্যের উদ্ভব হয়। প্রথমে আল্লা মানুষের মনে একটা অভাব, একটা স্পৃহা, একটা দুঃখ জাগাইয়া দেন, পরে তিনি সেই অভাব ও দুঃখ সম্বন্ধে বিবেচনা করেন এবং মানুষের হৃদয়ে তাঁহার বদান্যতা ও করুণার নিদর্শন স্বরূপ লতিফার প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁহার হৃদয়ে তাঁহার লতিফা জারি হয়, তিনি আত্মজ্ঞান হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন,—আল্লা তাঁহার নিকট চির প্রেমময় ও চির প্রিয়রূপে প্রতিভাত হন।

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিনাশ হইতেই পরম পুরুষের স্থিতি প্রমাণিত হয়। সুফীর ভাষায় বিনাশের পরে স্থায়ীত্ব-বিধানই মূল কথা। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে, ব্যক্তিত্বকে বিনাশ না করিতে পারিলে, আমিত্বকে সংহার না করিতে পারিলে, নিজের জীবনকে আল্লাময় করা যায় না। এই আল্লাময় হইবার জন্যই সুফী অবিরত চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু সুফিগণের সাধনভূমি লোক-পরিশূন্য কানন কান্তার নহে, লোক-পরিপূর্ণ সংসারাঙ্গন।

সুফী তাঁহার সাংসারিক জীবনের ভিতর দিয়াই সাধন-পথে অগ্রসর হন। তাঁহাদের মতে মোস্‌লেম জন-সমাজের মনে প্রকৃত আনন্দের পরিবেশন করিতে পারিলে যত সহজে আল্লাকে পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নহে। এক কথায়, সেবাধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই সুফী তাঁহার জীবনকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করিতে সমর্থ হয়েন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—:o:—

তওহিদ বা একত্বের অনুভূতির উপরেই ইস্‌লামের সুবিশাল সৌধ প্রতিষ্ঠিত। ইস্‌লামের প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ হয় আল্লাকে আহাদ বা এক জানার বিশ্বাস হইতে। 'কুল্‌হু আল্লাহু আহাদ'—বল, আল্লা এক—কোরানের এই মহাবাণীই মুসলমানের সর্ব্ব প্রধান অবলম্বন। আল্লা ওয়াহেদ—এক এবং অদ্বিতীয়, আল্লা লা-শরিক, কোরানের সর্ব্বত্র এই মহাশিক্ষাই ছড়ান রহিয়াছে।

সুফী মতানুসারে মানুষ আল্লার স্বরূপ। অতএব পরম পুরুষের সহিত যাঁহারা একেবারে মিশিয়া যান তাঁহারা 'ইন্‌সানুল কামেল' বা সর্ব্বগুণান্বিত মানব নামে অভিহিত হন। অতএব সর্ব্বগুণান্বিত মানব বলিলে কেবল নবিগণকেই বুঝাইবে না, সুফীদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে। ইঁহারাই ব্যক্তিগতভাবে ওলি এবং সমষ্টিগতভাবে আওলিয়া বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

ওলি বা সর্ব্বগুণান্বিত মানব তিনিই, যিনি পরম জোতিঃ লাভের অধিকারী হইয়াছেন—যাঁহার চিদাকাশ আল্লার নূরে আলোকিত, উদ্ভাসিত হইয়াছে। অজ্ঞাত ও অ-দৃষ্ট জিনিষ সম্বন্ধে যিনি জ্ঞান ও দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন, যাঁহার সম্মুখ হইতে অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠন অপসারিত হওয়ার ফলে একমাত্র সত্যালোকের সন্ধান পাইয়া যিনি আত্মত্যাগে ক্ষমবান হইয়াছেন, তিনিই ওলি। আল্লাকে আহাদ জানিয়া কেহ তাঁহার সাধনা করিতে করিতে তাঁহার সন্ধান ও সাক্ষাৎলাভ করিলে তাঁহার হৃদয়ের দুই কূল প্লাবিয়া কেবলই উল্লাসের বন্যা বহিয়া যায়! তখনই পথের শেষ হয়—কাম্যফল লাভ হয়। কিন্তু এই ফললাভ সকলের সমান হয় না। অধিকারী ভেদে, সাধনার গভীরতা একাগ্রতা ও পরিমাণ অনুসারে, উহার তারতম্য হইয়া থাকে।

তরিকা অবলম্বনকারীদিগকে নানা স্তরের ভিতর দিয়া, নানা বিষয়ে অনুভূতি অর্জ্জন করিয়া সিদ্ধির রাজ্যে পঁহুছিতে হয়। সর্ব্বগুণান্বিত মানবদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন হজরত মোহাম্মদ। তিনি নিজে সর্ব্বগুণান্বিত পূর্ণ মানব। যুগে যুগে যাঁহারা সর্ব্বগুণান্বিত মানবের পদলাভ করিয়া ধন্য

হন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই হজরতকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তিনি বাহ্য ও গুপ্ত, ধর্ম্মের এই দুই শাখারই পথ-প্রদর্শক।

স্বষ্টির পূর্ব্বে আল্লা পূর্ণ একত্বের দিক দিয়া নিজেই নিজেকে ভালবাসিতেন, এবং এই ভালবাসার ভিতর দিয়া নিজেই নিজের নিকটে প্রকাশিত হইতেন। বাহিরে এই ভালবাসার বিকাশ দেখিবার জন্য তিনি অ-স্থিতির মধ্য হইতে নিজের আকৃতি দিয়া হজরত আদমকে গড়িলেন—তাঁহারই মধ্যে এবং তাঁহাকে দিয়া আল্লা প্রতিভাত হইলেন। এইরূপে আল্লার আল্লাত্ব মানবতার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিল—লাহুত নাসূতের মধ্যে প্রকট হইল। মনসুর হাল্লাজ বলিয়াছেন—"আমিই তিনি যাঁহাকে আমি ভালবাসি এবং তিনিই আমি যাঁহাকে আমি ভালবাসি। একই দেহে আমরা দুই আত্মা বাস করি। আমাকে দেখিলেই তাঁহাকে দেখা হয়। আর যদি তুমি তাঁহাকে দেখ, তবে উভয়কে দেখা হয়।" কবি আমীর খুস্রু এই কথাই প্রেমের ভাষায় কি মধুর করিয়া গাহিয়াছেন—

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی
تا کس نا گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری

"মান্ তু শুদম্, তু মান্ শুদি,
মান্ তান্ শুদম, তু জাঁ শুদি,
তা কাস্ না গোয়েদ বাদ্ আজইঁ
মান্ দিগরম, তু দিগরি।"

আমি তুমি হব, তুমি আমি হবে,
আমি দেহ হব, তুমি প্রাণ হবে,
যেন অতঃপর কেহ না বলিতে পারে,
আমিও ভিন্ন, তুমিও ভিন্ন।

প্রেমের জন্য এই আত্ম বিস্মরণ ও আত্ম বিসর্জ্জন—নিজেকে এমন করিয়া বিলাইয়া দেওয়া—ইহা স্বর্গীয়, পৃথিবীর নহে, ইহা খোদা-প্রেমেরই রূপান্তর মাত্র।

আল্লার নিজের সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা তাহা এই জগৎ দ্বারা ব্যক্ত হয়। আরবীয় সুফী ইবনে আরাবী বলেন, "আল্লাকে বুঝিতে গিয়া আমরা তাঁহার মধ্যে যে গুণ আরোপ করি, আমরাই সেই গুণ। তাঁহার সত্ত্বাকে এই দৃশ্যমান জগতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই আমাদের সত্ত্বা বা অস্তিত্ব। আমাদের সত্ত্বার জন্যই আল্লার প্রয়োজন এবং তাঁহার নিজের নিকটে নিজে প্রকাশিত হওয়ার জন্যই আমরা এত প্রয়োজনীয়। এক কথায়, আল্লা সৃষ্টির ভিতর দিয়া নিজের স্বরূপ দেখেন।

তওহিদের জ্ঞান আরম্ভ হয় প্রকৃতি সম্বন্ধে সহজ জ্ঞানের জাগরণ হইতে। প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুই অন্তর-নয়নের সম্মুখে আল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক একটি বিশিষ্ট অভিজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়! বস্তুর নানা আকার ও পার্থক্য, পশু ও মানুষ, জীবন, স্বভাব, চিন্তা, ব্যক্তিগত ভাব, ইহাদের ভিতরে খোদার একত্বের এক অটুট ধারা প্রকাশিত রহিয়াছে। এই সকলের বিষয়ে মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া বরং এক আধ্যাত্মিক সত্বার বীজরূপে গণ্য হইয়া, উহা কেন্দ্রীভূত করিতে সহায়তা করিয়া থাকে।

এই সময় হইতেই শিক্ষার্থীর হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ হয়। তিনি তখন বুঝিতে পারেন,—সকলই আল্লার কাজ, সকল জিনিষের গুণ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লারই গুণ প্রকাশক, সকল বস্তুর বিদ্যমানতা বা স্থিতি মুখ্যতঃ আল্লারই বিদ্যমানতা বিজ্ঞাপক।

আধ্যাত্মিক উন্নতি স্তর-বিন্যস্ত, একদিনে কেহ সর্ব্বোচ্চ স্তরে পঁহুছিতে পারে না। স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া শেষ স্থানে, সর্ব্ববাঞ্ছনীয় স্থানে, গিয়া পঁহুছিতে হয়। একত্বের অনুভূতি তখন জাজ্বল্যমান হইয়া শিক্ষার্থীর নিকটে ধরা দেয়। শিক্ষার্থী তখন সিদ্ধমনোরথ হন।

সাধনার প্রথম স্তরে শিক্ষার্থী প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাকে প্রচ্ছন্ন দেখিয়া নিজের ভিতরেও তাঁহাকে দেখিতে পান। তখন আলোর দরবারে প্রথম হাজির হওয়ার ফলে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হীনপ্রভ হইয়া যায়। শিক্ষার্থী তখন আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিতে থাকেন, 'আমি মহান, আমি উচ্চ।' দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হইলে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই জ্ঞানের উদয় হয় যে الله نور السموات والارض —'আল্লাই স্বর্গ-মর্ত্তের আলোক।' আল্লা তখন তাঁহার নয়ন সমক্ষে আলোর আকারে প্রতিভাত হন,—তখন তিনি সকল জিনিষের একই সত্ত্বা অনুভব করেন। এই স্তরে পঁহুছিলে 'সকলই খোদা' এই ভাব শিক্ষার্থীর মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তৃতীয় স্তরে শিক্ষার্থীর অন্তর-নয়নের সম্মুখে সংখ্যা ও নামের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তিনি তখন প্রত্যেকের মূলে একই কম্পন দেখিতে পান। চতুর্থ স্তরে আল্লা শিক্ষার্থীর সকল ইন্দ্রিয়ের উপরে প্রোজ্জ্বল হইয়া দেখা দেন। পঞ্চম স্তরে শিক্ষার্থী প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাকে দেদীপ্যমান দেখেন। ষষ্ঠ স্তরে সকল বস্তুর কার্য্য-ধারা আল্লারই কার্য্য-ধারা বলিয়া অনুমিত হয়। সপ্তম স্তরে অন্ধকার চলিয়া যায়, পূর্ণ আলোর

বিকাশ হয়। শিক্ষার্থী তখন এই আলোর সাগরে ডুবিয়া গিয়া সুখ-দুঃখের অতীত হন। শিক্ষার্থী অষ্টম স্তরে পঁহুছিলে তাঁহার সত্ত্বা ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাতে লীন হইয়া যায়, যেমন করিয়া প্রদীপের আলো সূর্য্যের আলোর কাছে লীন হয়। নবম স্তরে সকল বস্তুর সত্ত্বা আল্লার আলোর ছায়াতে স্থান পায়। শিক্ষার্থী তখন একটী হইতে আর একটী বিভিন্ন করিতে পারেন না,—তাঁহার নিকট সকলই এক আত্মার সত্ত্বা বলিয়া বোধ হয়। এই সুখের অবস্থায় যখন শিক্ষার্থী উপনীত হন, তখন তিনি নিজেও আল্লার সত্ত্বার মধ্যে ডুবিয়া যান—তাঁহার নিজের সত্ত্বা হারাইয়া ফেলেন। এই সময়ে একত্বের মহাসাগর হইতে তরঙ্গ আসিয়া শিক্ষার্থীর ভিতরের আত্মভাবকে প্রহত করিয়া তাঁহাকে এক অতি অনির্ব্বচনীয় এবং অবর্ণনীয় গভীরতার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। এইরূপে তিনি নিত্য-সত্যের নিকটে পঁহুছিবার দ্বার-পথে গিয়া উপনীত হন।

"আল্লার পথে", "আল্লার সহিত", "আল্লাতে" প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিয়া শিক্ষার্থী যখন নিরবচ্ছিন্ন আত্মিক রাজ্যে উপনীত হন,—যেখানে যোগ নাই, বিয়োগ নাই, যেখানে পঁহুছিয়া তিনি কোথায়ও পঁহুছেন নাই, অথচ

কোনও এক স্থানে পঁহুছিয়াছেন—তখন তিনি দেখিতে পান যে, মানবদেহ পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে আত্মা যেখানে অবস্থিতি করিত, তিনি ঠিক সেই স্থানেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি তখন আত্মা, তিনি তখন জ্ঞান, তিনি তখন বুদ্ধি, তিনি তখন সুখ! ইহাই শেষ নয়, তিনি যে আছেন ইহা আর তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে হয় না! তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ সুখ, পূর্ণ নিত্যতা!

এইরূপে আল্লার সত্বা সম্বন্ধে, প্রভুর একত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ সুখের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তওহিদ অনুসরণকারী সর্ব্বজীব-হিতকর এক সুরে বাঁধা জীবন আরম্ভ করেন। এখন হইতে তিনি সর্ব্বপ্রকারের স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া পূর্ণভাবে ঐশী-ভালবাসার জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি আর তখন নিজের কথা ভাবেন না, পরের জন্য তিনি নিজেকে সঁপিয়া দেন,—মানবসেবার পথে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার উৎসর্গের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকেন। এই অবস্থায়, জীবন-রহস্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ করার ফলে তাঁহার মধ্যে কোনও প্রকারের অবসাদই থাকে না, তাঁহার দেহ জীবন্ময় হয়—ভালবাসাময় হয়।

এই শক্তি যখন কাজ করিতে থাকে, জীবন তখন

বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত হয়, এবং মৃত্যুর যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহাও তখন বাসনার অনুরূপ হয়। আল্লার জন্য বাঁচিয়া আছি, আল্লার জন্যই মরিব, ইহাই তখন এই মর-দেহকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে ব্যবহার করিবার একমাত্র পন্থা হইয়া দাঁড়ায়।

কেবল অনুভূতি দ্বারাই মানুষ অপর সকল সৃষ্ট জীব হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা না হইলে মানুষ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। জ্ঞান ও অনুভূতি অর্জ্জনের সহিতই মানুষ শক্তি-লাভ করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে তাহার কর্ম্ম ও সেবার পথ সহজগম্য হইয়া জীবনের ভ্রমণ পূর্ণ করিয়া দেয়। মানুষের যে নির্দ্দিষ্ট কাজ তাহা তখন শেষ হইয়া যায়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

——ঃ০ঃ——

একত্ববাদের ভিতরে যে সুগভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, মোস্‌লেম জন-সমাজ তদ্বিষয়ে অপরিজ্ঞাত থাকিয়াও কেবল শরিয়তের অনুশাসন মানিয়া চলিয়া আল্লার অবিনশ্বরত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বশক্তিমানত্ব, করুণা এবং জ্ঞান সম্বন্ধে যে সাধারণ বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন, তাহার ফলেই তাঁহারা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মজীবন যাপন কবিতে সক্ষম হন। তাঁহাদের অপরিহার্য্য ত্রুটি আল্লা ক্ষমা করিবেন এবং তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহারা চিরদিন নিঃসন্দেহ।

কিন্তু তওহিদের পথে ইহা প্রাথমিক আয়োজন মাত্র, সুবিপুল শিক্ষার পথ সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়া যায়। শিক্ষার্থীকে এই পথের সন্ধান করিয়া লইতে হয়। কোনও শিক্ষার্থীরই ইহা অজানা নাই যে, শরিয়তের ভিতর দিয়াই তাঁহাদিগকে মা'রফতের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইবে।

আল্লা বলিয়াছেন, "হে শান্তিপূর্ণ হৃদয়, হে নিরুদ্বিগ্ন আত্মা, সন্তুষ্টচিত্তে প্রভুর দ্বারা গৃহীত হইয়া তাঁহাতে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" কিন্তু কিরূপে এই কার্য্য সম্ভব হইতে

পারে? পথ-নির্দ্দেশ কে করিবে? কোন্ পথ অনুসরণ করিয়া চলিলে আত্মা শান্তিপূর্ণ হইবে, নিরুদ্বিগ্ন হইবে, প্রভুর দ্বারা সানন্দে গৃহীত হইবে? কে সেই পথ চলার সন্ধান দিবেন? আল্লা পরম করুণাময়, তাই পথ-প্রদর্শকের কথা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন—إني جاعل في الأرض خليفة ط —'পৃথিবীতে আমাদের খলিফা বা প্রতিনিধি আছে'।"

খোদা-প্রাপ্তির পথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খলিফা বা পথ-প্রদর্শক হজরত মোহাম্মদ। তৎপরে প্রতিনিধিত্ব করেন পীর বা মোর্‌শেদ। কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে, কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করিলে, শিক্ষার্থীর পক্ষে আল্লার সহিত মিলন সম্ভবপর হয়, সহজ ও সরল হয়, তাহা মোর্‌শেদগণই দেখাইয়া দেন। নূরে মোহাম্মদী হইতে তাঁহারা যে আলোক পান, যে শক্তিলাভ করেন, সেই আলোক ও শক্তির সাহায্যেই তাঁহারা শিক্ষার্থীর পথের অন্ধকার দূর করিয়া দেন,—দুর্গম পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন।

এই মহাকার্য্য সাধনের জন্য ইস্‌লামের অভ্যন্তরে কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দিয়া এবং সোহ্‌রাওয়ারদিয়া এই চারিটি * আধ্যাত্মিক মণ্ডলী আছে। এই

---

* কাদেরিয়া তরিকা বাগ্‌দাদের হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। যে সকল শিক্ষার্থী অত্যন্ত উৎসাহশীল, তাঁহারাই এই তরিকা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

মণ্ডলী ভুক্ত ওলিগণই পথ-প্রদর্শকের কাজ করিয়া থাকেন। এই সকল মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতাগণ সকলেই সুফি ছিলেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশিত পথ একরূপ না হইলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্যের ভিতরে কোন পার্থক্য নাই,—তাঁহাদের প্রদর্শিত গন্তব্যস্থানও বিভিন্ন নহে। সকল প্রাণ-মন দিয়া আল্লাকে পাওয়া এবং আল্লার ভিতরে মিশিয়া যাওয়া—ফানা ফিল্লায় পঁহুছানই এই তরিকাবলম্বীদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সকল তরিকার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছেন হজরত মোহাম্মদ। যখন আল্লার সহিত তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক মিলন হইত, যখন তিনি আল্লার সহিত এক হইয়া যাইতেন,—স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ পাওয়ার অবস্থায় গিয়া পঁহুছিতেন,—তখন তিনি আল্লার আদেশ বা কোরানের

যাঁহারা ভাব-প্রবণ তাঁহারা **চিশ্‌তিয়া** তরিকায় দীক্ষালাভ করেন। আজমীর শরিফের হজরত খাজা মুইনউদ্দিন চিশ্‌তি এই তরিকার প্রবর্ত্তক। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ **নক্‌শবন্দিয়া** তরিকা প্রচলন করেন। 'আল্লার সহিত মানুষের প্রত্যক্ষভাবে যোগ হইতে পারে, এই মতবাদীরা নক্‌শবন্দিয়া তরিকার অন্তর্ভূত। শেখ শাহাবুদ্দিন ওমর সোহ্‌রাওয়ারদি **সোহ্‌রাওয়ার্‌দিয়া** তরিকার প্রবর্ত্তন করেন। যাঁহারা চিন্তাশীল বা ভাবুক তাঁহারাই প্রধানতঃ এই তরিকা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

মহাবাণী প্রকাশ ও প্রচার করিতেন। জনমণ্ডলী যখন তাঁহার প্রত্যাদেশ পাওয়ার সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিত, তখন তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইত যে. সেই সময়ে তাঁহার মধ্যে স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইত. সেই সময়ে তিনি আল্লার আদেশ ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিতেন না—তিনি সম্পূর্ণরূপে খোদাময় হইয়া যাইতেন। এই-খানে আমরা আধ্যাত্মিক মোহাম্মদের সন্ধান পাই। এই অবস্থায় যখন তিনি পঁহুছিতেন, তখন তিনি খোদার সহিত এক তন্-মন্ হইয়া যাইতেন—তখন আর তাঁহার নিজের কোন সত্ত্বা থাকিত না, আল্লার সত্ত্বাতে বিলীন হইয়া যাইতেন। আধ্যাত্মিক জগতে মোস্‌লেম সাধকগণ হজরতের এই জীবনেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

আমরা যেন এই উপলক্ষে ভুলিয়া না যাই যে, হজরত মানুষ ছিলেন। উপরে তাঁহার যে জীবনের সন্ধান দেওয়া গেল, উহা তাঁহার যোগস্থ জীবন। যোগ ভঙ্গের পরে তিনি আবার নিজের লোকদের মধ্যে নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং বলিতেন, তিনিও তাহাদের মত মরণশীল জীব—মানুষ, আল্লার অনুকম্পার উপরেই একমাত্র নির্ভর-পরায়ণ। তিনি তখন সকলকে জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে আদেশ করিতেন

এবং বলিতেন যে, তাহারা তাহাদের সকল প্রার্থনা আল্লার নিকটে—একমাত্র আল্লার নিকটেই—নিবেদন করিবে।

যাঁহারা আল্লাকে পাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে কোরানকে সর্ব্বস্ব স্বরূপ গণ্য করিয়া, আধ্যাত্মিক মোহম্মদকে আলোরূপে গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও প্রেমের সহিত পীর, শেখ বা মোরশেদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে তাঁহারই নির্দ্দেশ মত সাধনার বা অনুভূতির পথ অতিক্রম করিতে হইবে। তাহাদের জীবন হইবে তখন সত্যের জীবন—অসত্যের সংশ্রব হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত ও স্বাধীন।

সাধন জগত এল্‌মে-সিনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এল্‌মে-সিনা বা হৃদয়ের জ্ঞান পীর বা মোরশেদ তাঁহার মুরিদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেন। যে ভাবে তিনি এই কাজ করিয়া থাকেন তাহা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিবার প্রথা নাই। উহা সাধনার গুপ্ততত্ত্বের অন্তর্ভূক্ত। এল্‌মে-সিনা সাধন জগতের জিনিষ, আর এলমে-সফিনা কোরান-হদিসে বর্ণিত ইস্‌লামের অনুশাসনের অঙ্গীভূত জ্ঞান। মূলতঃ এল্‌মে সফিনা দ্বারাই ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, উহাকে ত্যাগ করিয়া কেহ এল্‌মে সিনার রাজ্যে পঁহুছিতে পারেন না। এস্‌লামের প্রবর্ত্তক জোনাব রসুল করিম নিজে এ সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

——:০:——

সুফীমতবাদের যেমন ভাল দিক আছে, সেইরূপ তাহার মন্দ দিকও আছে। সুশিক্ষিত সুর বাঁধা মনের উপরে মায়াবাদ সম্বন্ধীয় দর্শনের মহান আদর্শরূপে সুফী-মতবাদ উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু সাধারণ মানব-সমাজের উপরে উহার ক্রিয়া মঙ্গলজনক হয় না, কারণ উহা এত উচ্চাঙ্গের যে সাধারণের পক্ষে উহা ধারণা করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইমাম গাজ্জালী অযোগ্য জনে সুফীমত প্রচার করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, কৃষকগণ তাহাদের কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আহলে মা'রফতের দাবী করিয়াছিল! তাঁহার মত এক জন শ্রেষ্ঠ সুফী মুসলমানের সামাজিক জীবনের এই ধ্বংসকারী ভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে সুফীমত বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইয়া পীর-পূজায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পীর-পূজা সুফীমতের খাঁটি

অনুসরণ নয়। ইস্‌লামের প্রচার ফলে যে পৌত্তলিকতা-ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, পীর-পরস্তির ভিতর দিয়া উহা আবার মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কোরান ও হদিসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মানুষ কখনও মানুষের পায়ে মাথা লুটাইতে পারে না। খোদার দেওয়া শির কেবল খোদারই উদ্দেশ্যে নত হইবে, অন্য কাহারও উদ্দেশে নয়। এক সময়ে ইস্‌লামের অভ্যন্তরে মানুষ-পূজারূপে পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইতে পারে মনে করিয়াই কোরান শরিফে এই কথা বার বার বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, হজরত রসুল করিম আর দশজনের মতই মানুষ, তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার নবুওতি লাভে, সত্য সনাতন ইস্‌লাম প্রচারে। তিনি মানুষই ছিলেন, কিন্তু তিনি আদর্শ মানুষ. সকলে যাঁহার অনুসরণ করিবে তেমনি মানুষ—তিনি মহামানব। হজরত নিজেও এই বিষয়ে কোরানের বাণীরই সমর্থন করিয়াছেন। ইহা না করিলে ইস্‌লামের মূলতত্ত্ব তওহিদের বিকৃতি ঘটিতে পারে মনে করিয়া তিনি এই সকল কথা অতি দৃঢ়ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

অযোগ্যজনে সুফীমত প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া বাঙ্গালার পীর সাহেবগণ মুসলমানের কর্ম্মশক্তিকে

বিমুখ করিয়া দিতেছেন মাত্র, হীন ও ক্ষীণ প্রাণে উচ্চতর জ্ঞানের বিকাশ করিয়া উহাতে কর্ম্মের নব প্রেরণা আনিতে পারিতেছেন না। এই কর্ম্মের প্রেরণার অভাবেই যে জাতি মৃতের মত পড়িয়া আছে, এই কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আমরা কত স্থানে দেখিয়াছি, কত নিরক্ষর মুসলমান কৃষক পীরসাহেবদের নিকট হইতে তাওয়াজ্জু লইয়া তাহাদের সংসারধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া পাগলের মত হইয়া গিয়াছে! তাহারা উন্নততর ধর্ম্ম-জীবনেরও সাক্ষাৎ পায় নাই, পরন্তু কর্ম্ম-বিমুখতার জন্য তাহাদের সাংসারিক অবস্থা দিন দিন খারাব হইয়া গিয়াছে! খোদাকেও তাহারা এত ভয় ও সম্মান করে না, যেমন করিয়া থাকে তাহারা পীরসাহেবদের। ইহা নিশ্চয়ই ইস্‌লামের আদর্শ নয়—ইস্‌লামের অঙ্গীভুত খাঁটি সুফীমতও নয়, ইহা তাহার বিকৃতি মাত্র—ইহা বোৎ-পরস্তিরই নামান্তর বা নব্য সংস্করণ। এই নৈতিক অবনতির জন্যই বঙ্গদেশে ইস্‌লাম আজ এত ক্ষুণ্ণ, মুসলমান আজ এত হেয় অবস্থায় পড়িয়া আছে। মনে রাখিতে হইবে, সুফীমত জ্ঞানীরই অনুসরণের বিষয়, অজ্ঞানের নহে।

প্রাচ্য ভারতে এবং প্রতীচ্যে আজ কাল কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, ভারতীয় বেদান্তসারকে ভিত্তি করিয়াই

সুফীমত প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই কথার মূলে কোনও সত্য নিহিত নাই। ইতিহাসের অনুসরণ করিয়া ইহার বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সর্ব্ব প্রথম খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট নওশেরোয়াঁর রাজত্ব-কালে ভারতবর্ষের সহিত পারস্যের অতি সামান্য মাত্র ভাবের আদান প্রদান হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা যে পারস্যের উপর ভারতবর্ষের কোনও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এমত বলা যায় না। বেদান্তের প্রভাবে পারস্য যদি সেই সময়ে প্রভাবান্বিত না হইয়া থাকে, তবে তাৎকালীন আর কোনও ইস্‌লামী দেশে যে হয় নাই, ইহা বিনা আপত্তিতেই বলা যাইতে পারে। ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহিত সর্ব্ব প্রথম পরিচিত হন আল্-বেরুনী, তিনি জাতিতে আরব অর্থাৎ সেমিটিক বংশ সম্ভূত ছিলেন। ইহা ৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আল্ বেরুনী ভ্রমণোদ্দেশে ভারতে উপনীত হইয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং দর্শন প্রভৃতি বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই সুফীমতবাদ আরব ও পারস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব ইহা কোনও রূপেই বলা সমীচীন নহে যে, সুফী মতবাদ বেদান্ত সারের অদ্বৈতবাদ হইতে

আদর্শ গ্রহণ করিয়া ইসলামের ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।*

* "The Aryan Re-action theory has two forms, which may be briefly described as the Indian and the Persian. The former, taking note of certain obvious resemblances which exist between the Sufi doctrines in this more advanced forms, and some of the Indian systems, notably the Vedanta Sara, assumes that this similarity (which has, in my opinion, been exaggerated, and is rather superficial than fundamental) shows that these systems have a common origin, which must be sought in India. The strongest objection to this view is the historical fact that though in Sasanian times, notably in the sixth century of our era, during the reign of Nushirwan, a certain exchange of ideas took place between Persia and India, no influence can be shown to have been exerted by the latter country on the former (still less on other of the lands of Islam)

পৃথিবীতে ইসলাম যেমন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছে, এমন আর কোন ধর্ম্মই করে নাই। ইসলাম নানা মতের ভিতর দিয়া একেশ্বরবাদে গিয়া পঁহুছে নাই, সরলভাবেই পঁহুছিয়াছে, এবং ততোধিক সরল ভাবেই উহা বিশ্বজনের নিকট প্রচার করিয়াছে। এইরূপ সরল, সহজে অনুধাবনের যোগ্য, একেশ্বরবাদের মধ্যেই অজ্ঞেয়কে জানিবার, বুঝিবার—ধ্যান করিবার চেষ্টা সর্ব্ব প্রথমে জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক। তাই ইসলামের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সুফীমতবাদেরও জন্ম হইয়াছে, কিন্তু ইহা অদ্বৈতবাদের মত নানা দেব দেবীর পূজার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। দুইটি মতের মধ্যে সাদৃশ থাকিলেও বলা যায় না যে উহার একটি আর একটি

---

during Muhammadan times till after the full development of the Sufi system, which was practically completed when Al-Biruni, one of the first Mussalmans who studied the Sanskrit language and the Geography, History, Literature and thoughts of India, wrote his famous memoir on these subjects."—Brown's A Literary History of Persia, Vol I. page 419.

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একই কারণে এই বিভিন্ন দেশে এই বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে, একে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে, একই আদর্শ স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে।*

সর্ব্বযুগে সকল সভ্যদেশেই এক দল মানুষের মন আত্মার সৃষ্টি কেন হইল, কোথা হইতে সে আসিল এবং কেনই বা আসিল ইহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। এই উৎসুকতার ভিতর দিয়াই অজ্ঞেয়বাদ জন্মলাভ করিয়াছে। দেশে দেশে ইহাদের চিন্তার ধারা নিজেদের জন্য নূতন নূতন পথ করিয়া লইয়াছে। অজ্ঞেয়কে জানিবার যে আকাঙ্ক্ষা ইহা মানুষের সহজাত প্রকৃতি সঞ্জাত, ইহা কোন জাতি বিশেষের একমাত্র অধিকারভুক্ত সন্ধানের বিষয় নয়। যে জাতির মধ্যেই জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেই জাতিই নিজের চিত্তের ভিতরে

---

* "There remains the possibility that Sufi mysticism may be an entirely independent and spontaneous growth. 'The identity of two beliefs', as Mr. Nicholson well remarks, 'does not prove that one is generated by the other ; they may be results of a like cause'." Ibid, page 421.

অজ্ঞেয়ের সন্ধান করিয়াছে এবং সাধনার বলে তাঁহাকে লাভ করিয়াছে।*

সুফীমতবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে এই একটি বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহা শরিয়তের বিরোধী নয়। যদি সুফীদের মধ্যে এমন কোন সম্প্রদায় থাকিয়া থাকে যাহারা শরিয়তের বিরুদ্ধবাদী, তাহারা নিশ্চয়ই ইসলাম-অনুশাসিত সুফী-মতাবলম্বী নহে। একটি প্রসিদ্ধ সুফীমণ্ডলীর অবশ্য প্রতিপাল্য দশটি নিয়ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, ইহা হইতেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

(১) সুফিগণ তাঁহাদের পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং হৃদয় পবিত্র রাখিবেন।

(২) সুফিগণ কখনও গল্প করিবার উদ্দেশ্যে মস্‌জিদে বা কোন পবিত্র স্থানে উপবেশন করিবেন না।

---

† "It must be regarded as a spoutaneous phenomenon, recurring in many similiar but unconnected forms wherever the human mind continues to concern itself with the problems of the Wherefore, the Whence and the Whither of the Siprit." Ibid, page 420.

(৩) সর্ব্ব প্রথমে তাঁহারা জমা'ত শামেল হইয়া নামাজ আদায় করিবেন।

(৪) রজনী যোগে তাঁহারা অধিক পরিমাণে উপাসনা করিবেন।

(৫) প্রত্যুষে তাঁহারা নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের ত্রুটীর জন্য খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন এবং তন্ময় চিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবেন।

(৬) প্রাতে তাঁহারা কোরান পাঠ করিবেন এবং সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেন না।

(৭) মগরেবের নামাজ এবং এশার নামাজের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তাঁহারা খোদার জেক্‌র করিবেন।

(৮) দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত এবং অন্য যাহারা তাঁহাদের নিকটে আসিবে, সকলকেই তাঁহারা সমাদর করিবেন এবং সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের কথা শ্রবণ করিবেন।

(৯) আহার্য্য দ্রব্য তাঁহারা একাকী আহার করিবেন না, উপস্থিত সকলে মিলিয়া আহার করিবেন।

(১০) একে অপরের নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া সঙ্ঘ হইতে অনুপস্থিত থাকিবেন না।

সঙ্ঘ-জীবনের এই সামান্য নিয়মাবলী হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইস্‌লামের প্রাথমিকযুগের সুফিগণ শরিয়তকে মানিয়া চলিয়াই অজ্ঞেয়ের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। খাঁটি সুফিগণ যুগে যুগে এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।

সকল মুসলমানেরই জানিয়া রাখা উচিৎ, পীরপরস্তি ইস্‌লামী সুফিমতের অঙ্গীভূত নয়, উহার জন্ম হইয়াছে হিন্দু ধর্ম্মের গুরু-ভক্তির ভিতর দিয়া, কারণ হিন্দুগণ গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। ভারতে মোস্‌লেম রাজশক্তির অবনতির যুগে জ্ঞান-ধর্ম্মের অবনতির সহিত মুসলমানগণ হিন্দুর গুরু-ভক্তি হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়াই ইস্‌লামের মহান আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পীর-পরস্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রকৃত আলোচনার সহিত পীর-পরস্তি রূপ পরগাছাও ইস্‌লামের অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িবে এবং ইস্‌লাম আবার তাহার সনাতন মত ও পথ ধরিয়াই উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

সমাপ্ত।